সপ্তম অধ্যায়

মনসামঙ্গল কাব্য থেকে অন্নদামঙ্গল কাব্য পর্যন্ত বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন

সপ্তম অধ্যায়

মনসামঙ্গল কাব্য থেকে অন্নদামঙ্গল কাব্য পর্যন্ত বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন ও অন্নদামঙ্গল কাব্য বিশ্লেষণ করে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক সময়কালের মধ্যযুগীয় বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা হয়েছে; প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সামাজিক ইতিহাসের একটা বিবর্তন-ধারা ধরা পড়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে এই বিবর্তনের চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে। আমাদের আলোচনার সুবিধার্থে মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য-ধারা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সহায়তা গ্রহণ করা হবে। মনসামঙ্গল থেকে অন্নদামঙ্গল কাব্য পর্যন্ত অর্থাৎ পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাঙালীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক চরিত্রের বিবর্তন-চিত্র এই অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ডঃ অতুল সুর 'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন' গ্রন্থের ভূমিকায় 'বিবর্তন' শব্দটি প্রয়োগ সম্পর্কে বলেছেন – " 'বিবর্তন' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'পরিবর্তন'। 'বিবর্তন' শব্দের সঙ্গে অবনতি বা উন্নতির কোন সম্পর্ক নেই।"[১] বর্তমান নিবন্ধে 'বিবর্তন' শব্দটিকে অনুরূপ অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে। বস্তুত কালক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে সামাজিক ইতিহাসের যে রূপান্তর ঘটেছে তাকেই প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

একথা ঠিক যে, বাঙালী সমাজ অনেকটা রক্ষণশীল; তবে এই রক্ষণশীলতা বাঙালীর দোষ ও গুণ উভয়ই। সমাজের চারিদিকে রক্ষণশীলতার লক্ষ্মণরেখা টেনে দেওয়ায় যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন জাতির দ্বারা আক্রান্ত হয়েও বাঙালী জাতির সংস্কৃতি আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। বিদেশী-বিজাতীয় শক্তি বারবার আঘাত করলেও বাঙালীর জাতিগত সত্বাকে বিনষ্ট করতে পারেনি। এক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা লৌহবর্মের মত বাঙালী সমাজকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করেছে; আবার যখন প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়েছে তখন নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্মের ভিতর থেকেই সাংস্কৃতিক ও ধর্মনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। একারণেই বাঙালী সমাজ বিদেশীয় সংস্কৃতির দ্বারা আক্রান্ত হলেও আপন স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন না দিয়ে বিদেশী-বিজাতীয় সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে আপন শক্তি সঞ্চার করেছে। আবার এই রক্ষণশীলতা বাঙালী সমাজের দোষ বলেও বিবেচিত হয়েছে। বলা হয়েছে, বাঙালী সমাজ অনেকটা স্থবির; তার নিজস্ব পরিমণ্ডলকে সহজে পরিত্যাগ না করায় সমাজের অভ্যন্তরে পরিবর্তন বা বিবর্তনের ঢেউ সহজে লাগেনি, তাই সমাজের গঠনতন্ত্রে তেমন অদলবদল হয়নি।

মঙ্গলকাব্যসমূহের প্রায় সকল কবিই, বিশেষত বিপ্রদাস পিপিলাই, মুকুন্দ চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র তৎকালীন সমাজের যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তার একদিকে যেমন স্থবিরতা পরিলক্ষিত হয় তেমনি অপর দিকে বৃত্তিগত, পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত জীবনধারার রূপান্তরও পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের নায়কগণ তাদের বীরত্ব ও শৌর্যের প্রকৃত নিয়ন্তারূপে কোন না কোন দেবতা বা দৈবশক্তিকে তুলে ধরেছে। এই দৈবশক্তি কঠোর নিয়ন্ত্রণবাদ, কর্মবাদ, দৈববাদকেই প্রতিফলিত করেছে। আবার ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও গোষ্ঠীগত পুরুষকার বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের নায়কদের মধ্যে উৎকৃষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নিয়ন্ত্রণবাদ, দৈববাদ ও কর্মবাদের মধ্যে স্থবিরতা লক্ষ করা গেলেও পুরুষকার সমাজের পট পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। এই দুয়ের সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গীতেই মঙ্গলকাব্যের সমাজ ইতিহাসের বিবর্তনকে বুঝতে হবে। বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের ফলে শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে; একারণে সামাজিক গঠনতন্ত্রে না হলেও জীবনধারায় ও জীবনচর্চায় বিবর্তন ঘটেছে। তাই খাদ্য-পানীয় থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-বিচার ও সংস্কার-বিশ্বাসে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়— এই ভিন্নতাকেই এখানে বিবর্তন বলা হয়েছে। বস্তুত রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সমাজের

আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনগুলি ধীরে ধীরে হচ্ছিল।

তুর্কী আক্রমণ সর্বপ্রথম বাঙালীর স্থবির জীবনে আঘাত করে। প্রাক্ তুর্কী আক্রমণকালে বাঙালী সমাজ ধর্ম, জাত্যভিমান, দেশাচার ও দেশাচারগত বিধিনিষেধের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল, কিন্তু আক্রমণের অভিঘাত বহির্জগতের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ করে দিল। ফলে মানুষের অজ্ঞাতসারেই দেশজ সংস্কার-সংস্কৃতিকে ছাপিয়ে লোকমানসের বিবর্তন, গণজীবনের সংস্কার ও সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটে চলেছিল। সমকালীন সাহিত্যে বিশেষত মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই বিবর্তনের ছাপ ধরা পড়েছে। ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার যথার্থই বলেছেন— "কোন সমাজকে যেমন তার বিবর্তন ধারার সংগে সম্পর্কিত না করে বিচার করা যায় না, তেমনি বিশেষ কালের সাহিত্যকেও তার কাল পরিবেশ এবং সমাজ পরিবেশের পটভূমিতে সংস্থাপন না করে বিচার করা যায় না।"[২] অর্থাৎ এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, কোন সমাজ পুরোপুরি স্থবির হতে পারে না, সুতরাং বিবর্তনের পটভূমিতেই তাকে দেখা উচিত। জীর্ণ লোকাচারের ভারে যখন সমাজ ইতিহাসের গতিপথ রুদ্ধপ্রায় হয়ে এসেছিল তখন তুর্কী আক্রমণের অভিঘাত সমাজকে সচল করতে সাহায্য করেছিল। আরও পরবর্তীকালে সমাজের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনগুলি সাধিত হয়েছিল। এই বিবর্তন অবশ্য এক দিনে ও খুব সরল গতিতে হয়নি, ধীরে ধীরে ও সর্পিল গতিতে সম্পন্ন হয়েছে। কাজেই গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ না করলে এই বিবর্তনের স্বরূপ বোঝা খুব কঠিন। সুতরাং দেখা যায় যে, মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত সমাজব্যবস্থার উপর বাইরের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে কার্যকরী না হলেও তার পরোক্ষ প্রভাব আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে। তুর্কী আক্রমণ যদি আদৌ সংঘটিত না হত তাহলে তৎকালীন সামাজিক বিবর্তন একই ভাবে চলত এই দাবী যথার্থ বলে মনে হয় না। সুতরাং মঙ্গলকাব্যের সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস বিচার করার ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ বিবর্তনের পশ্চাতে যে সমস্ত বাহ্য প্রভাব কাজ করেছে তাদের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় জ্ঞাত থাকা প্রয়োজন, মধ্যযুগের কাব্য নির্ভর আলোচনায় নির্ভুল কালক্রম অনুযায়ী আবিষ্কৃত পুথির পাঠ ও সঠিক তথ্য পরিবেশনের অভাবে যথার্থ সমাজ ইতিহাসের বিবর্তন আলোচনায় অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার সঙ্গত কারণেই লিখেছেন – "সমাজ-বিবর্তনের প্রবাহও সরল রেখায় অগ্রসর হয়না – সর্পিল রেখায় চলে। তাছাড়া, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনার প্রধান অন্তরায়, নির্ভুল ঐতিহাসিক ক্রম অনুযায়ী প্রাপ্ত পুথির নির্দিষ্ট কাল নির্দেশের অভাব। ঐ অভাব সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনকে আরও বেশী সর্পিল করে দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বিবর্তনের ইংগিত সুস্পষ্ট।"[৩]

ইতিহাস মৃত্তিকাখণ্ড বিশেষ নয়, মানুষই ইতিহাসের প্রধান অবলম্বন। আর জনপ্রবাহ যেহেতু একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা ,তাই এর শেষ কখনো হয় না। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন ——

"ইতিহাসে নিরন্তর
চিহ্নহীন তার পদধ্বনি
বেজে-বেজে চলে,
বিপ্লব-আবর্ত ছন্দে
কভু দ্রুত কভু বা মন্থর
দুর্বিষহ জীবনের ভারে।"[৪] 'জনৈক'

কবির বাণীকে সামনে রেখেই বলি, মানুষের ইতিহাস এক চিরন্তন আবর্তে এগিয়ে চলে।

কোন সময়কালকে বুঝতে হলে, সেই কালের জনজীবনের স্বরূপ বোঝা দরকার। সেই সময়ের মানুষ দৈনন্দিন জীবন-যাপন — ধর্ম, কর্ম, আমোদ-প্রমোদ কিভাবে সম্পাদন করতেন তার বর্ণনা থেকে সেই কাল সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

মধ্যযুগের ধর্মাশ্রিত সাহিত্যে বাংলার সমাজ জীবনের যে উপাদান-উপকরণ বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে তা

আহরণের মধ্যে দিয়ে বাংলার জন-জাতি ও সমাজের একটা পূর্ণাঙ্গ বিবর্তনশীল চরিত্র ধরা যেতে পারে। তবে সাহিত্য-নির্ভর আলোচনায় সমাজ ইতিহাসের উপাদান চয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কেননা সাহিত্য নির্ভর সামাজিক উপাদানের সবগুলিই বাস্তব সামাজিক নিরিখে এসেছে তা নয়। কল্পনা ও লোকশ্রুতির মিশ্রণে গড়ে ওঠা সাহিত্য পুরোপুরি বাস্তব হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া মধ্যযুগীয় কবিদের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অবশ্যই থেকে গেছে। উপাদান গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে তাই যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে।

মঙ্গলকাব্য-ধারা লক্ষ করলে দেখা যায়, তার প্রধান তিনটি ধারা হল –মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, ও অপ্রধান দুটি ধারা হল— শিবায়ন বা শিবমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল। এই সকল ধারাগুলির মধ্যে একটা কালগত ব্যবধান রয়েছে। তাছাড়া একটি নির্দিষ্ট ধারায় ভৌগোলিক পরিবেশেরও ভিন্নতা রয়েছে। রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে যে রীতি-রেওয়াজ ও জনজীবনের পরিবর্তন ঘটে তাই-ই নয়, ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারেও সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন মনসামঙ্গল উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে পৃথক ভাবে রচিত হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলেও অনুরূপ তিনটি বিভাজন আছে। আবার ধর্মমঙ্গল মূলত রাঢ়বঙ্গের বিষয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই বিভাজনগুলিতে সামাজিক ইতিহাসের অনেকাংশে পার্থক্য ও অনেকাংশে মিল আছে। যেমন ধর্মমঙ্গলে রাঢ়বঙ্গের মানুষের শৌর্য-বীর্য, দেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, যা অন্য কোন মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায় না। আবার সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে সৃষ্ট পীরগাথা জাতীয় সাহিত্যে ধর্ম সম্পর্কে সে কালের মানুষের বিশিষ্ট চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এজাতীয় পরিবর্তনগুলিকে বিবর্তনের রূপরেখায় ধরা হয়েছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে দিল্লীর সঙ্গে বাংলার একটা সম্পর্ক স্থাপিত হল। এর পরবর্তী দেড়'শ বছর কার্যত বাংলার শাসকরা ছিলেন পরস্পর আত্মঘাতী কলহে লিপ্ত — কার্যত স্বাধীন হলেও একটা সামান্য সম্পর্ক দিল্লীর সঙ্গে রক্ষিত হয়েছিল। ইলিয়াসশাহী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা হলে দিল্লীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। সুলতানি আমলের অবসান ঘটলে বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটল তার মূল্য কম নয়। কিন্তু বাংলাদেশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা শুধু রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে সীমাবদ্ধ না থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিরাট বিবর্তন নিয়ে আসে। সুলতানি আমলে যে সমস্ত মুসলমান শাসক এদেশে এসেছিলেন, তাঁরা অনেকেই দেশে ফিরে যাননি – বরঞ্চ বলা যায় এদেশের ভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে যুক্ত করে ফেলেন। এদেশের বিপুল সম্পদ থেকে রাজস্ব হিসাবে সংগৃহীত অর্থ কিছুটা নিজেদের ভোগ-বিলাসিতা ও সামরিক খাতে ব্যয় করলেও দেশের অর্থ দেশেই থেকে যেত। কিন্তু মোগল আমলে সুবাদারগণ স্বল্প সময়ের জন্য দায়িত্বভার নিয়ে এদেশে আসতেন এবং কার্যকালের মেয়াদ শেষ হলে তাঁরা দিল্লী ফিরে যেতেন – সুতরাং অল্প সময়ে যতটা অর্থ সংগ্রহ করা যায় সেদিকে ব্যস্ত থাকতেন। মোগল সুবাদারগণ নবাবের অনুগৃহীত হবার জন্য প্রচুর অর্থ উপঢৌকন হিসেবে দিল্লী পাঠাতেন. এইভাবে জাহাঙ্গীরের আমল থেকে ঔরঙ্গজেবের আমল পর্যন্ত বিপুল পরিমাণ বাংলার অর্থ প্রতি বছর বাংলার বাইরে চলে যেত। বাংলার নবাবেরাও পরবর্তীকালে প্রচুর অর্থ নজরানা স্বরূপ দিল্লী প্রেরণ করতেন। এভাবে অর্থ প্রেরণের ফলে বাংলার অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হত। তবে একথা স্বীকার করে নিতে হয় যে, মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক বিবর্তনের ঢেউ লাগে।

তুর্কী আক্রমণ সর্বপ্রথম গ্রাম বাংলার স্থবির জীবনের সীমারেখাকে ভেঙ্গে উন্মুক্ত করে দিলেও তুর্কীরাও খুব একটা সচল সংস্কৃতির ধারাকে বহন করতে পারেনি। কিন্তু মোগল আমলে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে বাংলা আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক কূপমণ্ডুকতা দূর হয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ এমনকি বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়. ফলে দৃষ্টি উন্মুক্ত হয়। গোটা

বিশ্বের সামাজিক, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটে।

মোগল শাসন স্থাপিত হলে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে যে বিবর্তন আসে তার গুরুত্ব কম নয়। সুলতানি আমলে বাঙালী বণিকরা যেমন বিদেশে বাণিজ্য করতে যেত না তেমনি বিদেশী বণিকরাও এদেশে বাণিজ্য করতে আসত না। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাংলার বণিকদের যে বহির্বাণিজ্যের বিবরণ পাওয়া যায় আসলে তা তৎকালীন ঐতিহাসিক বিষয় নয়। সুলতানি যুগে প্রধানত দু-চার জন আরবীয় ও চীনা বণিক আসত। কিন্তু মোগল আমলে বিদেশীয় বণিকগোষ্ঠী, বিশেষত পর্তুগীজ বণিকদের একাধিপত্য শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ বণিকদের আগমন ঘটতে থাকে। বাংলার কৃষিজাত পণ্য সহ কুটীরশিল্পজাত দ্রব্য ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ সহ বিদেশী বাজারে জনপ্রিয়তা অর্জন করে, সুতরাং ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে দারুণ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে। মঙ্গলকাব্যগুলিতেও এই স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে অধিক মুনাফা লাভের কারণে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা পড়ে যেতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নবাবদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মোগল রাজসভা থেকে আগত বিলাস-ব্যাভিচার এবং ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এক দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। জনগণ কপর্দকশূন্য হয়ে দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই বিপর্যয়ের চিত্র পাওয়া যায়।

বাংলার সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রেও যে পরিবর্তন বা বিবর্তনের ঢেউ লেগেছিল তাও গুরুত্বপূর্ণ। সুলতানি যুগের প্রারম্ভ থেকেই ভারতবর্ষের বাইরে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে ভাগ্য সন্ধানী শাসক, সৈনিক, ধর্মপ্রচারক, চিকিৎসক, কবি, শিল্পীগণ এদেশে আসতে থাকেন। বিশেষত ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী সহ অন্যান্য নগর -- শহরগুলিতে তারা ভীড় জমাতে থাকেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যে ও রামপ্রসাদ সেনের বর্ণনায় তৎকালীন বর্ধমান শহরে বিচিত্র মানুষের বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার চিত্র পাওয়া যায়। যাই হোক তাঁরা এদেশে আসার সময় তাঁদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে বহন করে নিয়ে আসেন। ধীরে ধীরে এদেশে এসে বসবাস করার ফলে তাঁরা যেমন নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে দূরে চলে যেতে থাকেন তেমনি এদেশীয় জনগণও তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয় – এইভাবে উভয়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় ঘটে যেতে থাকে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের বাইরে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে যে সমস্ত কবি, শিল্পীরা আসেন, তাঁদের উন্নত সাহিত্য সম্পদের সঙ্গে এদেশীয় মুসলমানদের পরিচয় ঘটতে থাকে। সুতরাং তাঁরা এসবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আরবী, ফারসী, উর্দু ও হিন্দি ভাষার সাহিত্যকর্ম বাংলায় অনুবাদ করতে থাকেন। ফলে বাংলা সাহিত্যে আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে রোমান্টিক প্রণয় কাব্য নামে এক জাতীয় কাব্য গড়ে ওঠে দৌলতকাজী ও সৈয়দ আলাওলের হাতে। তাছাড়া মুসলমান কবিদের দ্বারা মুসলমানী সাহিত্য নামে নতুন সাহিত্য ধারার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

মোগল আমলে সরকারী ভাষা ছিল ফারসী। তাছাড়া নাগরিক সমাজে কথ্য ভাষা হিসাবে আরবী-ফারসী, উর্দু ইত্যাদি ভাষার মিশ্রণ ঘটে যায়। বৈষয়িক প্রয়োজনে আরবী-ফারসী ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই মিশ্রভাষা ব্যবহৃত হতে থাকে। ভারতচন্দ্রের মত কবি কাব্যরস সৃষ্টির দিকে লক্ষ রেখেই 'যাবনী' ভাষা ব্যবহারের গুরুত্ব অনুভব করেন। বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষত তৎকালীন কোলকাতা, মুর্শিদাবাদের মত নগরগুলিতে কথ্যভাষা হিসাবে 'যবনী' ভাষা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙালীর ধর্মীয় জীবনেও পরিবর্তনের ঢেউ এসেছিল। এর হোতা হলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কারের মধ্যে থেকেই বাঙালী সংস্কৃতির জন্ম হলেও বৌদ্ধধর্মের কাছে অন্যান্য ধর্ম অবারিত দ্বার ছিল। খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম গৌরব হারিয়ে ফেলেছিল। পালরাজাগণ বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও তাঁরা অন্যান্য ধর্মেরক্ষেত্রে উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সেনরাজাগণ ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের

উপাসক ছিলেন। সুতরাং সেনযুগে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাঙালী জাতি ও সমাজব্যবস্থার ভিতরেই অস্তায়মান বৌদ্ধধর্মের শেষ চিহ্ন রয়ে গেল। এইভাবে কয়েক'শ বছর অতিক্রান্ত হবার পর বৌদ্ধধর্মের শেষ ধারাটি চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে মিশে গেল। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যে জোয়ার এসেছিল বাঙালী সমাজ তার দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়। তাই দীনেশচন্দ্র সেন চৈতন্যদেবকে মানব প্রেমের মূর্ত অবতার রূপে আখ্যায়িত করেছিলেন।[৫] ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় চৈতন্যদেবের ধর্ম সাধনার মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা লক্ষ করেছিলেন। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ারে ভাঁটা পড়ে যায়। অবশ্য কতিপয় বৈষ্ণব আচার্য্যের চেষ্টায় বৈষ্ণব ধর্ম পুনরুজ্জীবিত হওয়ার প্রয়াস পেল। তাছাড়াও বৈষ্ণব ধর্ম-কর্মের সঙ্গে ইসলামীয় সুফী সাধকদের পরিচয় ঘটে এবং তারা পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রধর্মের প্রভাবে সুফী অধ্যাত্মবাদী সাধনা প্রভাবিত হয় এবং খানিকটা বিকৃত হয়ে পড়ে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে বৈষ্ণব ধর্মেও বিকৃতি দেখা দেয়। বৌদ্ধ তন্ত্রাচারীদের প্রবেশের ফলে বৈষ্ণব ধর্মেও সহজিয়া, কর্তাভজা ইত্যাদি নানা শাখার সৃষ্টি হয়। আর চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই সামাজিক প্রয়োজনের ক্ষেত্র থেকেই লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক মঙ্গলকাব্য - ধারার জন্ম হয় এবং মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্য-ধারা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য নিয়েও পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য রচিত হতে থাকে। এইভাবে নানা আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের বাঙালী সমাজ এগিয়ে চলে। এখন পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলিতে সমাজ ইতিহাসের যে তথ্যগুলি তুলে ধরা হয়েছে তার নিরিখে সমাজ ইতিহাসের বিবর্তন-চিত্র রচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। এই বিবর্তনের ধারাকে সুস্পষ্ট কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনায় অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই ভাগগুলি হল —

১. উপাদানগত বিবর্তন।

২. সামাজিক অবস্থাগত বিবর্তন।

৩. জাতি-বৃত্তিগত বিবর্তন।

৪. রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তন।

৫. অর্থনৈতিক বিবর্তন।

৬. ধর্মনৈতিক বিবর্তন।

১) উপাদানগত বিবর্তন ঃ মানুষের জীবনধারণের উপাদান এত বিচিত্র ধরনের যে তাদের কয়েকটি সুস্পস্ট ভাগে বিভক্ত করা যায়। এখানে উপাদানগত বিবর্তনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। যথা– ক) বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদানের বিবর্তন।

খ) সংস্কার ও বিশ্বাস- কেন্দ্রিক উপাদানের বিবর্তন।

গ) ভাব-কেন্দ্রিক উপাদানের বিবর্তন।

ঘ) বাক্-কেন্দ্রিক উপাদানের বিবর্তন।

ঙ) ক্রীড়া-কেন্দ্রিক উপাদানের বিবর্তন।

ক) বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদানের বিবর্তন ঃ বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদান বলতে বোঝায় খাদ্য-পানীয়, গৃহস্থালীর উপকরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজ-সজ্জা, বাদ্যযন্ত্র, যোগাযোগ ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে।

খাদ্য পানীয় ঃ প্রথমে দেখা যাক্ বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদান— খাদ্য-পানীয়ের কথা। মঙ্গলকাব্যগুলি থেকে বাঙালীর খাদ্য প্রবণতা অনুযায়ী তিক্ত-কষায়-অম্ল-মধুর চার রকমের খাদ্যরীতির ব্যবহারই লক্ষ করা যায়, তবে ঐ চার রকম স্বাদের হরেকরকম ব্যঞ্জন তৈরী হত। মঙ্গলকাব্যে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন এমন কি চৌষট্টি ব্যঞ্জনেরও উল্লেখ

পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল থেকে ভাতই বাঙালীর প্রধান খাদ্য। গমের ব্যবহার বিশেষ ছিল না। অনেক ঐতিহাসিকের মতে— মধ্যযুগের বাঙালীরা গম বা রুটি খেত না।"[৬] সম্ভবতঃ তথ্যটি সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত নাও হতে পারে। মুসলমান আগমনের পর এদেশে বিশেষভাবে গম বা রুটি খাওয়ার প্রচলন হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসাবিজয়' কাব্যে রুটি খাওয়ার কথা পাওয়া যায়। চৈতন্য-পরবর্তীকালে মুসলমান সমাজে এবং হিন্দুসমাজে রুটি খাওয়ার বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বাঙালী মুসলমান সমাজে 'হেরা রুটি'র উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যেও রুটির উল্লেখ আছে। গমজাত খাদ্য হিসাবে লুচির ব্যবহার পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং লুচি বাঙালীর খাদ্য তালিকায় শোভাবর্দ্ধন করেছে অনেক পরবর্তীকালে। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমে রচিত ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে ঘিয়ে ভাজা লুচির বিবরণ পাওয়া যায়। এই শতকের মধ্য পর্বে রচিত ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে লুচির বিবরণ পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে বাঙালীর খাদ্য তালিকায় লুচি-কচুরির প্রবেশ সম্পর্কে লিখেছেন – "কোন্ প্রাচীন বাঙালী কবি লুচি-কচুরির বর্ণনা করেছেন? ও লুচি-কচুরি এসেছে পশ্চিম থেকে।"[৭] সুতরাং খাদ্যরীতির বিবর্তনে এটা একটি বিশেষ সংযোজন বলা যায়।

প্রধান খাদ্য ছাড়াও বাঙালীর খাদ্য স্বভাবে সামান্য বিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। বাঙালীর খাদ্য তালিকায় রয়েছে বিভিন্ন প্রকার শাকসব্জি, ফুল-মূল ও মাছ-মাংস। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে খাম আলু, মউয়া আলু ও মিষ্টি আলুর উল্লেখ দেখা যায়। এই সময়ে রচিত বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে আলুর উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত এখানে আলু বলতে মউয়া আলু বা মিষ্টি আলুকেই বোঝাত। কেননা পর্তুগীজদের আগমনের পরই এদেশে আলুর ব্যবহার শুরু হয়। আলুর ব্যবহার সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন – "বিশেষভাবে মধ্যযুগে, পর্তুগীজদের চেষ্টায় এবং অন্যান্য নানাসূত্রে নানা তরকারি, যেমন আলু, আমাদের খাদ্যের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে।"[৮] প্রথমদিকে বাঙালীরা আলুকে বিদেশী, বিজাতীয় ফল মনে করে ঘৃণা করত, তবে ধীরে ধীরে তাদের এই স্পর্শদোষ কেটে যায়।সুতরাং ধরে নেওয়া যায় ষোড়শ শতাব্দীর আগে বাঙালীর খাদ্য তালিকায় আলুর অনুপ্রবেশ ঘটেনি। এই বিদেশীয় সব্জিটিকে বাঙালী সহজে গ্রহণ করেনি বলেই কবিরা খাদ্য ও রন্ধন বর্ণনায় আলুর উল্লেখ করেননি। পরবর্তীকালে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত চৈতন্য জীবনী কাব্যগুলিতে আলুর উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাঙালীর খাদ্য তালিকায় একটি অপরিহার্য ব্যঞ্জন হল ডাল। প্রধানত মুগ, মাষ, ছোলা, মটর, খেসারি ডালের প্রচলন থাকলেও মসূর ডালের ব্যবহার উচ্চবর্ণের, বিশেষত ব্রাহ্মণ সমাজে ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দনের নির্দেশ অনুসারে বাঙালী ব্রাহ্মণরা মসূর ডালের ব্যবহার শুরু করেছিল।[৯] তাই পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে মসূর ডালের উল্লেখ নেই। ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দ চক্রবর্তী থেকে শুরু করে পবরর্তীকালের প্রায় সকল কবিই খাদ্য তালিকায় মসূর ডালের উল্লেখ করেছেন। বৈষ্ণবরাও সম্ভবত মসূর ডাল খেত না। তাছাড়াও শাক্সবজি, ফল-মূল খাদ্য হিসাবে ব্যবহারেও নানা প্রকার বিধিনিষেধ ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে এসব বিধিনিষেধ হ্রাস পাওয়ায় কবিরা অকপটেই খাদ্য তালিকায় এগুলি উল্লেখ করেছেন।

মাছ বাঙালীর অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। কিন্তু মাছ খাওয়া সম্পর্কেও নানা বিধিনিষেধ ছিল। বৃহদ্ধর্মপুরাণ অনুসারে আঁশবিহীন মাছ ও যে সকল মাছ সাপের মত দেখতে সেগুলি ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য ছিল।[১০] তাছাড়া শুঁটকি মাছও উচ্চবর্ণের সমাজে ব্যবহৃত হত না, তবে নিম্নবর্ণের সমাজে শুঁটকি মাছের ব্যবহার হত। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে এসমস্ত বিধিনিষেধ হ্রাস পাওয়ায় ব্রাহ্মণ কবিরাও অকপটে আঁশবিহীন ও আঁশযুক্ত বা অন্যান্য মাছের প্রচুর উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া মাংস ও ডিম হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হত। হাঁস ও মুরগীর ডিম,

বিশেষত মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা খেত, তবে উচ্চবর্ণের লোকেরা মুরগীর মাংস ও ডিম খেত না। কচ্ছপের মাংস ও ডিম, পাঁঠা ও খাসীর মাংস, হরিণের মাংস, কবুতরের মাংস প্রধানত হিন্দুরা খেত। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যেও ঐ সকল মাংসের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা, বিশেষত ডোম ও ব্যাধ সম্প্রদায়ের লোকেরা ইঁদুর, শূকর, সজারু, গো-সাপ ও গোধার মাংস খেত। মুসলমানরা গো-মাংস খেত, হিন্দুর কাছে তা ছিল সম্পূর্ণ অভক্ষ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দুসমাজেও বিভিন্ন প্রকার মাংস খাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে বিভিন্ন প্রকার মাংসের ব্যঞ্জনের উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে বিত্তবান হিন্দুর ঘরে মুসলমান ঘরানার, বিশেষত মোগলাই খানা'প্রবেশ করে যায়। ভারতচন্দ্র কালিয়া, কোর্মা, কাবাব, দোলমা, সেকচি, সামসা, পোলাও ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন।ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় -

"কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা কোল।
সীকপোড়া ঝুরী কাঁটালের বীজে ঝোল॥
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই।
কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই॥
মায়া সোনাখড়কীর ঝোল ভাজা সার।
চিঙড়ীর ঝাল বাগা অমৃতের তার॥
কন্ঠা রান্ধি রান্ধে রুই কাতলার মুড়া।
তিত দিয়া পচা মাছে রান্ধিলেক গুঁড়া॥
আম্র দিয়া শৌলমাছে ঝোল চড়চড়ী।
আড়ি রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী॥
রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈলশাক।
মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক॥
বাচার করিলা ঝোল খয়রার ভাজা।
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা॥
সুমাছ বাছের বাছ আর মাছ যত।
ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈলা কত॥
বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম।
গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম॥
কচি ছাগ মৃগমাংসে ঝাল ঝোল রসা।
কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা॥
অন্ন মাংস সীকভাজা কাবাব করিয়া।
রান্ধিলেন মুড়া আগে মসলা পূরিয়া॥" (ভারতচন্দ্র/৩৪১-৩৪২)

তবে সাধারণ নিম্নবিত্তের হিন্দুর খাদ্য তালিকায় এই খাবারগুলি প্রবেশ করেনি। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত কোন কাব্যে এসমস্ত খাবারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবাবী পাক্‌শালা থেকে অভিজাত হিন্দু পরিবারে এসমস্ত খাবার প্রবেশ করে যায়। ভারতচন্দ্র শিক্‌ভাজা মাংসের কাবাবের উল্লেখ করেছেন। উচ্চবর্ণের বাঙালীরা এই খাবার না খেলেও মুকুন্দের কালকেতুর শিকপোড়া গোধিকাকে কাবাবের পূর্বপুরুষ বলা যায়।

মিছরি সম্ভবত মিশর থেকে আগত। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে একমাত্র ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যেই মিছরির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং পরবর্তীতে ভারতচন্দ্রের কাব্যে এর উল্লেখ আছে। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীতেই বাঙালীর খাদ্য হিসাবে মিছরি ব্যবহার হতে থাকে একথা অনুমান করা যায়। আবার 'সূপ' ব্যবহারের কথা পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যগুলি ও চৈতন্য জীবনী কাব্যগুলিতে। যার অর্থ 'ঝোল' বা রান্না করা ডাল, শব্দটি সম্ভবত বাংলা নয়, দক্ষিণ ভারত থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে শব্দটি বাংলায় এসে থাকবে। চৈতন্য-পূর্ব যুগে রচিত কাব্যগুলিতেও সূপের ব্যবহার পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্ষেমানন্দের কাব্যে 'কাঁজি'র উল্লেখ পাওয়া যায়। 'কাঁজি' শব্দটির অর্থ ভাতের মাড়; কিন্তু সাধারণ ভাবে তা আমানি বা অম্লজল হিসাবে পরিচিত। শব্দটি দক্ষিণ ভারত থেকে উড়িষ্যার মধ্যে দিয়ে বাংলায় এসেছে।[১১] সম্ভবত চৈতন্য-পরবর্তীকালে নিম্নবিত্তের বাঙালীর খাদ্য তালিকায় এর অনুপ্রবেশ ঘটে থাকবে। তাছাড়া ভারতচন্দ্রের কাব্যে চিনা চাউল, বাজরার চাউল ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। অন্য কোন মঙ্গলকাব্যে এর উল্লেখ নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রারম্ভিক পর্বে এসমস্ত দানাশস্য বাঙালীর খাদ্য তালিকায় প্রবেশ করে থাকবে।

বিভিন্ন প্রকার ফলমূলের মধ্যে একমাত্র ক্ষেমানন্দের কাব্যেই মর্তমান কলার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা সম্ভবত 'মার্তামান' থেকে আগত। পর্তুগীজরাই বিভিন্ন ধরণের ফল, গোলআলু, রাঙ্গাআলু, জারুল, সফেদা, পেঁপে চীনাবাদাম, কেশুবাদাম, আনারস, কামরাঙা, পেয়ারা, আতা, নোনা, লঙ্কা, মরিচ এদেশে ক্রমে ক্রমে আমদানি করেছিল।[১২] সুতারং ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন বিদেশী জাতি আগমনের পূর্বে এর ব্যবহার শুরু হয়নি বলে অনুমিত হয়।

বাঙালীর রান্নায় পেঁয়াজ ও রসুনের ব্যবহার শুরু হয়েছিল মুসলমান আগমনের পরেই। কিন্তু বাঙালী হিন্দুর হেঁসেলে পেঁয়াজ ও রসুনের প্রবেশ ঘটেনি। তাই কোন কবিই পেঁয়াজ-রসুনের উল্লেখ করেননি। সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্ষেমানন্দই প্রথম পেঁয়াজ-রসুনের উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এই সময়েই পেঁয়াজ-রসুনের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে বাঙালীর খাদ্য প্রবণতারও কিছুটা বিবর্তন ঘটেছে।

পান-সুপারি খাওয়ার প্রবণতা বাঙালীর অতি প্রাচীন। এদেশে মুসলমান আগমনের পরে মুসলমানরাও পান-সুপারি গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তবে সম্ভবত উচ্চবর্ণের সমাজেই পান-সুপারি ব্যবহার হত। পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে সাধারণ মানুষও পান-সুপারি খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু এবং ধর্মমঙ্গলে ডোমদের পান-সুপারি খাওয়ার কথা পাওয়া যায়। অন্যান্য নেশাকর দ্রব্যের মধ্যে গাঁজা, ভাঙ্, ধুতুরা, আফিম ও পোস্তের ব্যবহার থাকলেও তামাকের ব্যবহার ছিল না। মধ্যযুগে পর্তুগীজরাই তামাকের প্রচলন করে।তামাক এদেশে আকবরের রাজত্বের শেষাশেষি এলেও সপ্তদশ শতাব্দীর আগে বাংলাদেশে তার প্রচলন হয়নি। কারণ সপ্তদশ শতকের প্রথম পর্বের আগে মোগলরা এদেশে দখলীস্বত্ব কায়েম করতে পারেনি।[১৩] তবে আমীর-ওমরাহরাই তামাকের ব্যবহার করত।[১৪] পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত বিপ্রদাসের কাব্যে মুসলমান সমাজে তামাকের ব্যবহার পাওয়া যাচ্ছে। এই বিবরণ অবশ্য পরবর্তীকালে সংযোজন হতে পারে। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে তামাক ব্যবহারের বিবরণ পাওয়া যায়। আহমদ শরীফের বিবরণ অনুসারে মধ্যযুগের মধ্যপর্বে তামাক প্রশস্তিসূচক 'তামাকু পুরাণ', 'হুক্কাপুরাণ' কাব্য রচিত হয়।[১৫] এসমস্ত তথ্য জনসমাজে তামাকের ব্যাপক প্রচলন নির্দেশ করে।

গৃহস্থালীর দ্রব্য : বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদান হিসাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় গৃহস্থালীর উপকরণগুলি মনসামঙ্গল থেকে চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন ও অন্নদামঙ্গলে একই প্রকার এবং এগুলি অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালী সমাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে মুসলমান আগমনের পর দু'-একটি বাসনপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র বাঙালী সমাজে ব্যবহার শুরু হয়েছে, যেমন – সানকি, বদনা, হুঁকো ইত্যাদি। বিপ্রদাস কাব্যে হুঁকো বা হুঁকার ব্যবহারের উল্লেখ

করেছেন। ক্ষেমানন্দের কাব্যে সানকি ও বদনা ব্যবহারের উল্লেখ আছে। তাছাড়া কৃষিকাজের সহায়ক যন্ত্রপাতি থেকে অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটেনি। মুসলমানদের আগমন বাঙালী সমাজে জীবন-জীবিকার সহায়ক নতুন কোন যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও গৃহস্থালীদ্রব্যের প্রচলন করেনি।

পোশাক পরিচ্ছদ ঃ মধ্যযুগের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে পোশাক-পরিচ্ছদে। মধ্যযুগের প্রথম পাদে সাধারণত বাঙালীর পোশাক-পরিচ্ছদে বৈচিত্র্য ছিল না। সাধারণ বাঙালীর পোশাক ছিল পুরুষের ধুতি-চাদর ও নারীর শাড়ী। নীহাররঞ্জন রায়ের বিবরণ অনুযায়ী— "ধুতি ও শাড়িই ছিল প্রাচীন বাঙালীর সাধারণ পরিধেয়, তবে একটু সংগতিসম্পন্ন লোকদের ভিতর ভদ্র বেশ ছিল উত্তরবাসরূপে আর-এক খণ্ড সেলাই-বিহীন বস্ত্রের ব্যবহার, যাহা ছিল পুরুষের ক্ষেত্রে উত্তরীয়, নারীদের ক্ষেত্রে ওড়না। ওড়নাই প্রয়োজনমত অবগুণ্ঠনের কাজ করিত। দরিদ্র ও সাধারণ ভদ্র গৃহস্থ নারীদের একবস্ত্র পরাটাই ছিল রীতি, এবং সেই বস্ত্রাঞ্চল টানিয়াই হইত অবগুণ্ঠন।"[১৬] ঐতিহাসিক গোলাম হুসায়ন সলীমও বাঙালীর পোশাক-পরিচ্ছদের অনুরূপ বর্ণনাই দিয়েছেন।[১৭] তবে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের পোশাক-পরিচ্ছদে পার্থক্য যথেষ্টই ছিল। সাধারণভাবে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের পোশাক-পরিচ্ছদের পাথর্ক্য ছিল না। ঐতিহাসিক কালীকিঙ্কর দত্ত মধ্যযুগে মধ্যবিত্তের পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনায় লিখেছেন— "Middle class people used to wear a picec of cotton cloth and a piece of dobaya or ekapatta during the summer and during the winter they protected themselves from cold, some by using another piece of cloth (dohar) and some a haman or glap over their body. Sometimes during the winter, some of them managed to procure a benian or merjai for their bodies. Some middle class men of advanced age used venat and rejai's at night"[১৮] ধুতি, চাদর ও শাড়ীই প্রধান পোশাক হলেও হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের পোশাক-পরিচ্ছদে পাথর্ক্য দেখা যায়। মুসলমানরাই বাঙালীর পোশাক-পরিচ্ছদে বৈচিত্র্য নিয়ে আসে। মুসলমানদের প্রধান পোশাক হল তহবন, কুর্তা, পাগড়ী, জামা, ইজার, পিরান বা পৈরান, টুপি ইত্যাদি। মঙ্গলকাব্যগুলিতে মুসলমানদের এসমস্ত পোশাকের ব্যবহার আছে। অভিজাত পুরুষরা, রাজ-পুরুষরা অনেক সময় কাবাই, শেরোয়ানি, জোব্বা, চাপকান, পাজামা, নিমা পরিধান করত। মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য শাখাতেও এসমস্ত পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবহার আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে এসমস্ত পোশাকের ব্যবহার নেই, তবে সপ্তদশ শতকে রচিত ধর্মমঙ্গলে, অষ্টাদশ শতকের অন্নদামঙ্গলে হিন্দুদেরও এসমস্ত পোশাক ব্যবহার করতে দেখা যায়। হিন্দু-মুসলমানের ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কিন্তু পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারে নি। এর কারণও কিন্তু ঐতিহাসিক। মুসলমান শাসনকালে পেশাগত কারণেই হোক বা রাজ-আনুকূল্য লাভের প্রত্যাশায় হোক হিন্দুরা মুসলমান শাসকদের সংস্পর্শে চলে এসেছিল। এবং এরাই ধীরে ধীরে মুসলমান রাজদরবারের বিলাস-বৈভবে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে তারাই নিজেদের সমাজে ঐ সমস্ত মুসলমানি পোশাক প্রচলন করে। এইভাবেই বোধহয় হিন্দু রাজদরবারগুলিতে মুসলমানি দরবারি পোশাক পরিধান করার রীতি প্রচলিত হয়েছিল এবং ক্রমশ তা জনসমাজেও প্রচলিত হয়ে যায়। পাগড়ী, কাবাই, চোগা, চাপকান, শেরোয়ানি, জোব্বা ব্যবহার প্রচলিত হয়। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে কলিঙ্গ রাজসভায় গমনকালে ভাঁড়ু দত্ত পাগড়ী ব্যবহার করে। বৈষ্ণব মহান্তরা পর্যন্ত পাগড়ী ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলে একজন বৈষ্ণব মহান্তকে পাগড়ী ব্যবহার করতে দেখা যায়। হিন্দু মহিলাদের পোশাক-পরিচ্ছদেও মুসলমানি ঘরানার পোশাক বিবর্তন এনেছিল। তাই বাঙালী কবি শ্রীরাধার রূপ বর্ণনায় লিখেছেন -

"নীল ওড়না মাঝে মুখ শোভা করে।
সোনার কমল বলি দংশিল ভ্রমরে॥"[১৯]

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সেকালের সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলাদের পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনায় লিখেছেন - "প্রায় সমস্ত শুভ

কর্মোপলক্ষ্যে পশ্চিমোত্তর দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের ন্যায় কাঁচুলি, ঘাঘড়া ও ওড়না পরিধান করিতেন।"[২০] ভারতচন্দ্রের কাব্যেও মহিলাদের ঘাঘড়া ও ওড়না ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সুতরাং বেশভূষা পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবহারে বাঙালী সমাজের বিবর্তিত রূপটি ধরা পড়ে। দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করার ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের পোশাক-পরিচ্ছদেই কিছুটা বিবর্তন এসেছিল। বিভিন্ন প্রকার শৌখিন ও সূক্ষ্ম বস্ত্রের ব্যবহার থাকলেও ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী জাতির আগমনের ফলে চিকিমিকি, মলমল, কিরমিজি, আসমান তারা ইত্যাদি বিদেশী বস্ত্রের ব্যবহারও চালু হয়েছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে উৎপাদিত বস্ত্রও ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি জগজ্জীবনের কাব্যে গুজরাটি বস্ত্রের উল্লেখ আছে। যেমন কবি প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী—

"গুর্জ্জরাটি অম্বর করিল পরিধান।
উপরে উড়ানি দিল কুসুম বসন।" (জগজ্জীবন/১৯৪)

রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়নে 'গুজরাটি ছিট' কাপড়ের উল্লেখ আছে। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় আরও বৈচিত্র্য আছে, তিনি দিল্লীর দরবারে ভবানন্দকে 'বিলাতী খেলাৎ' দিয়েছেন। রামপ্রসাদ সেন বনাত, মখমল, পটু, ভূষণাইখাসা, বুটাদার ঢাকাইয়া ইত্যাদি বস্ত্রের কথা বলেছেন। মঙ্গলকাব্যের বাইরে অন্যান্য সাহিত্য শাখাতেও পোশাক-পরিচ্ছদের বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের সাধারণ বাঙালী ছিল নগ্নপদ। ব্রাহ্মণরা খড়ম ব্যবহার করত তবে অভিজাত ও ধনীরা জুতা ব্যবহার করত। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে ঐ একই রকম বিবরণ পাওয়া যায়। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে গোটা মধ্যযুগে এই রীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি।

অলঙ্কার ব্যবহারেরক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজে খুব একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মঙ্গলকাব্যের কবিগণ বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে একই ধরনের অলঙ্কারের উল্লেখ করেছেন। মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য শাখাতেও বিভিন্ন রকম অলঙ্কারের উল্লেখ আছে। সাধারণত সোনা-রূপার তৈরী, মণি-মুক্তা খচিত বিভিন্ন রকম অলঙ্কার নারীরা ব্যবহার করত। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন রকম বৈচিত্র্যপূর্ণ অলঙ্কার ব্যবহার করত। বাংলাদেশের অঞ্চল ভেদেও অলঙ্কার ব্যবহারের পার্থক্য ছিল না, তবে ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে এবং উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের তথাকথিত অন্ত্যজদের মধ্যে গহনা ব্যবহারে পার্থক্য ছিল। উচ্চবিত্তের পরিবারের নারীরা প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করত। ঐতিহাসিক ষ্ট্যাভোরিনাস অলঙ্কার বিভূষিতা বঙ্গললনাদের দেখে লিখেছিলেন —"Adorn their hair with gold bodkings, and their arms, legs and toes, with gold or silver rings, and hands, as like-wise their ears, and the cartiledge of the nose."[২১] দরিদ্র নারী-পুরুষরা সাধারণত রূপা ও পিতলের তৈরী গহনা, বাজু, হার, রসকাটি ইত্যাদি ব্যবহার করত।

মধ্যযুগে পুরুষরাও গহনা ব্যবহার করত। শিশু এবং বালক ছাড়াও যুবকরা বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার পরতে অভ্যস্ত ছিল। তবে মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে এসে পুরুষের গহনা পরার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছিল। সাধারণত পুরুষের গহনা পরিধানের প্রবণতা কম ছিল। অলঙ্কার ব্যবহারে দেখা যায় বাঙালী সমাজে বিবাহ বা বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে প্রায় একই প্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করা হত। অনুষ্ঠান বিশেষে গহনা ব্যবহারের পার্থক্য ছিল না। তবে পুরুষরা সাধারণত বিবাহের সময় বেশী অলঙ্কার পরত। জমিদার ও সামন্ত শ্রেণীর লোকেরা প্রচুর অলঙ্কার ব্যবহার করত।

বঙ্গললনার অলঙ্কার বৈচিত্র্য এত বেশী ছিল যে, বিভিন্ন সময়ে বিদেশীদের আগমনের পরও বাইরে থেকে আমদানি করা অলঙ্কারের প্রবেশ ঘটেনি। অন্তত মঙ্গলকাব্যগুলিতে সে রকম সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত মুসলমানী সাহিত্যে কিছু কিছু অলঙ্কারের নাম পাওয়া যায়, যেমন – ছনলুয়া, আরবেকী, পায়জের

ইত্যাদি। মঙ্গলকাব্যগুলিতে এসমস্ত অলঙ্কারের উল্লেখ নেই। সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীতেই ঐ অলঙ্কারগুলি বাঙালী সমাজে ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছিল। তবে হিন্দু বাঙালী সমাজে এসব অলঙ্কারের ব্যবহার হত বলে মনে হয় না।

একই কথা বলা যায় রূপচর্চা বা প্রসাধনের ক্ষেত্রেও। মঙ্গলকাব্যে বাঙালী রমণীর রূপচর্চার পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। কোন রকম কৃত্রিম উপাদান ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ ভেষজ-প্রাকৃতিক উপাদান সহযোগে রূপচর্চার বিবরণ পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যগুলিতে চুয়া, চন্দন, কুঙ্কুম, কস্তুরী, কাজল দ্বারা রূপচর্চার বিবরণ পাওয়া যায়। তবে হিন্দুর পাশাপাশি দীর্ঘকাল বসবাস করার ফলে হিন্দুর মত মুসলমান রমণীরাও অনেকে সিন্দুর ব্যবহার করতে শিখেছিল।[২২] মুসলমান রমণীরা গন্ধদ্রব্য হিসাবে আতর, চোখে সুরমা ও হাতে-পায়ে মেহেন্দি ব্যবহার করত। মুসলমান কবিদের দ্বারা রচিত কাব্যগুলিতে ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গগীতিকার 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' পালায় মেহেন্দি বা 'মেন্দী' ব্যবহারের উল্লেখ আছে। যেমন –

"মেন্দী দিয়াছে কন্যা বাটিয়া চরণে।
সুরমা দিয়া আঁকিয়াছে দুইটী নয়নে॥
সেইত নয়ানে কন্যা যার পানে চায়।
আদম পুরুষ নারী পাগল হইয়া যায়॥"[২৩]

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের কাব্যগুলিতে এই উল্লেখগুলি পাওয়া যায়। কিন্তু মঙ্গলকাব্যে এসবের অনুল্লেখ থেকে মনে হয় হিন্দুসমাজে এগুলির ব্যবহার হত না। আসলে প্রসাধন ও রূপচর্চার প্রচুর উপকরণ অতি প্রাচীনকাল থেকেই বঙ্গরমণীগণের করায়ত্ব ছিল; সুতরাং বিদেশীর নিকট এবিষয়ে ঋণ গ্রহণ করতে হয়নি।

বাদ্যযন্ত্র ঃ পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় চার'শ বছর ধরে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাঙালীর সঙ্গীতচর্চা ও বাদ্যযন্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত চর্যাপদ, লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং চতুর্দশ শতাব্দীর কাব্য বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যে যে সমস্ত রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে সেগুলির উল্লেখ চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে. কিন্তু মঙ্গলকাব্যে নতুন রাগ-রাগিণীর উল্লেখ নেই তা নয়। তবে মঙ্গলকাব্যের মত বিস্তৃত বর্ণনাবহুল কাব্যের গায়ন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আঙ্গিকে সম্ভব ছিল না। অবশ্য কোন কোন মঙ্গলকাব্যের নিজস্ব গায়ন পদ্ধতি ছিল। মঙ্গলকাব্য থেকে সঙ্গীত সম্পর্কিত যে তথ্য পাওয়া যায় তা হল বাদ্যযন্ত্রের বিবরণ। শুধু মঙ্গলকাব্যেই নয়, মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য শাখাতেও প্রচুর বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়াও দীর্ঘ চার'শ বছরের রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রধান-অপ্রধান, পরিচিত-অপরিচিত বহু বাদ্যযন্ত্র – যা বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত হত তার উল্লেখ পাওয়া যায়, এগুলির সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া কঠিন। মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারায় নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের তালিকা দেওয়া হয়েছে।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্রগুলির প্রায় সবগুলি উল্লেখ পাওয়া যায় অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে। তাঁর উল্লিখিত একটি নতুন বাদ্যযন্ত্র হল 'নৌবত' বা নহবত। আলাওলের পদ্মাবতীতে 'বিউগল'[২৪] নামক বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। মনে করা যেতে পারে ঐ বাদ্যযন্ত্রগুলি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে বাঙালী সমাজে অজ্ঞাত ছিল। আবার বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য এবং চৈতন্য জীবনী কাব্যে উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্রের বেশীরভাগই প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যেই পাওয়া যাচ্ছে। আবার কিছু বাদ্যযন্ত্র ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে।পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মঙ্গলকাব্যে কিছু কিছু বাদ্যযন্ত্রের অনুল্লেখ থেকে অনুমান করা যেতে পারে ঐ বাদ্যযন্ত্রগুলি সে সময়ে অজ্ঞাত ছিল। আবার কতগুলি বাদ্যযন্ত্রের নাম পরবর্তীকালের কাব্যে উল্লেখ না থাকায় ঐ বাদ্যযন্ত্রগুলি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছিল বলে মনে করা যায়। কতকগুলি বাদ্যযন্ত্রের নাম পাওয়া যাচ্ছে যেগুলির পরিচয় উদ্ধার করা একালেও সম্ভব হয়নি, যেমন – মঙ্গল, বরগো, চন্দ্রহাস, ধূসরী, বেণী, রামবেণী, দোখণ্ডী, ঠমক, চন্দ্রতারা,

পঞ্চশব্দী ইত্যাদি। এগুলি ধীরে ধীরে জনসমাজ থেকে হারিয়ে গেছে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিছু কিছু বাদ্যযন্ত্র জনসমাজে পরিচিত হয়েছে; কেননা ঐ সময় মোগল রাজসভা থেকে দেশীয় রাজা বা জমিদারদের রাজসভায় সেগুলি প্রবেশ করেছিল। মোগল রাজদরবারের অনুকরণেই দেশীয় রাজা-জমিদাররা রাজসভায় শিল্প-সঙ্গীত চর্চা করতেন। আধুনিক যুগের প্রারম্ভেই শিল্প-সঙ্গীত চর্চায় বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে যায়। বিশেষত বর্গী আক্রমণ ও পলাশীর যুদ্ধ এবং বিভিন্ন সময়ে শাসকের শোষণের ফলে মানুষ গান-বাজনা ও সঙ্গীত চর্চা ছেড়ে দিয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের অন্বেষণে লিপ্ত হয়, ফলে প্রাচীন সঙ্গীত-বাদ্যের অনেকটাই লুপ্ত হয়ে যেতে থাকে। তাছাড়া মানুষের রুচি পরিবর্তনের ফলেও সেকালের সঙ্গীত-বাদ্যাদির বিবর্তন ঘটে যেতে থাকে। রাজ্যেশ্বর মিত্র বাংলার সঙ্গীত বিবর্তন প্রসঙ্গে লিখেছেন— "সেকালের প্রচলিত বহুপ্রকার প্রবন্ধ সঙ্গীত হঠাৎ বিলুপ্ত হ'ল। এবং তার স্থলে কাব্যসঙ্গীতের নবতর অভ্যুদয় ঘটল। প্রাচীনধারার এই যে বিলুপ্তি এর জন্য রাজনৈতিক গোলযোগ অনেকটা দায়ী হ'তে পারে, কিন্তু মধ্যযুগীয় ধারার বিলোপসাধন যে কতকটা সহসাই ঘটেছে আমাদের সঙ্গীতের বিবর্তন দেখে সেটা অস্বীকার করবার উপায় নাই।"[২৫] সঙ্গীতে বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের বিবর্তন ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক।

বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান – পূজা-পার্বণ, বিবাহ, সন্তানের জন্মোৎসব, অন্নপ্রাশন ইত্যাদিতে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের কোন তারতম্য ছিল না। প্রায় সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রই সকল প্রকার অনুষ্ঠানে বাজানো হত। এমন কি শোভাযাত্রা বা বিজয়োৎসবে ব্যবহৃত রণবাদ্যগুলিও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে বাজানো হত, তেমনি অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ও শোভাযাত্রা বা বিজয়োৎসবে বাজানো হত। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এমন কি একালেও এবিষয়ে কোন বাছবিচার নাই।

বিপ্রদাসের কাব্যে, আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে, রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যে বিবাহ শোভাযাত্রায় আতস বাজী ব্যবহারের কথা আছে। সেকালে হাউই, ভুঁইচাপা, তুবড়ি, চরখি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আতস বাজী পোড়ানো হত। বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেবের কাব্যে আতস বাজীর ব্যবহার উল্লেখ নেই। মনে হয় ষোড়শ শতাব্দীতে মোগলদের আগমনের পরে আতস বাজীর ব্যবহার বাংলাদেশে প্রচলিত হয়েছিল।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ সমগ্র মধ্যযুগে বাংলাদেশের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা ছিল একেবারেই অনুন্নত এবং মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে এসেও যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থায় কোন রকম পরিবর্তন ঘটেনি। স্থলপথে ও জলপথে পরিবহনের চিরাচরিত মাধ্যমই প্রচলিত ছিল। তবে মধ্যযুগে মুসলমান আগমনের পরে এদেশে স্থলপথে যাতায়াতের জন্য পশুবাহন হিসাবে উটের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে উটের উল্লেখ পাওয়া যায়। বস্তুত ইংরেজ প্রাধান্যের পূর্বে এদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটেনি।

গৃহনির্মাণ ঃ মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাঙালীর গৃহনির্মাণ সম্পর্কিত তথ্য আছে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাঙালীর গৃহনির্মাণ ও নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিবরণ পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিপ্রদাসের কাব্যে মনসার সিজুয়া পর্বতে বসতি স্থাপন, ষোড়শ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতুর গুজরাট নগর স্থাপন, সপ্তদশ শতাব্দী ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ধর্মমঙ্গলে ইছাই ঘোষের ত্রিষষ্ঠীগড় স্থাপন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যপর্বে ভারতচন্দ্রের কাব্যে বর্ধমান নগরের বিবরণ পাওয়া যায়। তাছাড়াও রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বর্ধমান নগরের বিবরণ, রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী রচিত 'গোসানীমঙ্গল' কাব্যে কান্তেশ্বরের জামবাড়ি নগর স্থাপন সেকালের নগর স্থাপনের দৃষ্টান্ত। বস্তুত কাব্যের বর্ণনা হলেও সে যুগে গ্রাম ও নগর স্থাপনের দৃষ্টান্ত ঐতিহাসিক সত্য। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এরকম বহু গ্রাম স্থাপন করেছিলেন বলে জানা যায়। কৃষ্ণচন্দ্র নিজের নামে কৃষ্ণপুর গ্রাম ছাড়াও হরধাম ও আনন্দধাম গ্রাম স্থাপন করেন এবং রেউই গ্রামকে কৃষ্ণনগরে পরিণত করেন।[২৬]

কাব্যের বিবরণ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে সেকালের নগরগুলি ঠিক একালের নগরের মত ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীর নগর পরিকল্পনা অপেক্ষা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে নগর পরিকল্পনার পার্থক্য আছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বা শাসকের শোষণে জর্জরিত নানা বৃত্তিধারী মানুষ কালকেতুর গুজরাট নগরে এসেছে এবং আপন সামাজিক অবস্থান অনুসারে বসতি স্থাপন করেছে। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর নগরের ঘরবাড়িগুলি তৈরী হত বাঁশ, কাঠ, দড়ি, কাদামাটি, পাথর দিয়ে এবং তালপাতা ও খড়ের ছাউনি দিয়ে। এই নগরগুলি আসলে সমৃদ্ধ গ্রাম। বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে মনসার সিজুয়াতে বসতি স্থাপন, কিংবা মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে কালকেতুর গুজরাট নগর স্থাপন বনকেটে বসতি স্থাপন মাত্র। মধ্যযুগে বন কেটে বসতি স্থাপনের কথা ঐতিহাসিক সত্য। শোষিত ও বিপর্যস্ত মানুষকে নানা প্রলোভন ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের বসতি স্থাপনের জন্য আহ্বান করা হত। কালকেতুর গুজরাট নগর স্থাপন একালের সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে হোসেন মিঞার ময়না দ্বীপে বসতি স্থাপনের মত। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গলে ইছাই ঘোষের ত্রিষষ্ঠীগড় স্থাপন কিংবা ভারতচন্দ্রের বর্ধমান নগর অনেকাংশে একালের শহরের মত। এখানে বসবাস স্থাপনের জন্য মানুষকে আহ্বান করার প্রয়োজন হয়নি। কৃষ্ণনগর বা বর্ধমানের মত নগরে ধনী বণিক সম্প্রদায়, আমীর-ওমরাহরা, সামন্ত জমিদাররা, বুদ্ধিজীবী রাজকর্মচারীরা সামাজিক বিন্যাস অনুসারে বসবাস করত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্ধমানের মত নগরে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফিরিঙ্গি, দিনেমার বণিকরা ছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বণিকরা ব্যবসা- বাণিজ্যের জন্য বসবাস করত। ষোড়শ শতাব্দীর কালকেতুর গুজরাট নগরের বাসিন্দাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বেচাকেনার জন্য নগরের পাশে হাট থাকত। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে হাসনহাটির হাট, শ্রীকলার হাট, মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে তিয়র হাটের প্রসঙ্গ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর নগরগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নগর-বাজার থাকত। দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য চলত এই বাজারগুলিতে। নগরগুলিতে সারি সারি দোকানপাট থাকত। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে ও রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বর্ধমান নগরের সমৃদ্ধির বর্ণনা আছে। এই নগরগুলি তৈরী হত সাধারণত ইট, কাঠ, পাথর, চুন-সুড়কি দিয়ে।

মধ্যযুগে গৃহনির্মাণ পদ্ধতিতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট ছিল। দরিদ্ররা কাদামাটি, বাঁশ, কাঠ, বেত, খড়, নাড়া দিয়ে তৈরী ঘরে বসবাস করত – তাতে ভাল বেড়া বা ভাল ছাউনি থাকত না। ঘরগুলি সাধারণত আটচালা, চারচালা, দোচালা হত; দোচালা ঘরগুলিকে 'বাংলাঘর' বলা হত। এই ঘরগুলি সাধারণত উলুখড়, শীতলপাটি, পাটকাঠি, নলখাগড়া, সুন্দিবেত ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত হত। মৈমনসিংহগীতিকার 'মলুয়া পালা'য় নিম্নবিত্ত বাঙালীর গৃহনির্মাণ চিত্র পাওয়া যায়-

"কামলার কাম বিনোদ তাও ভালা জানে।
ভালা কইর‍্যা বান্ধে বাড়ী সত্যা নদীর কানে॥
আটচালা চৌচাল ঘর বান্ধিয়া সুন্দর।
ভালা কইর‍্যা বান্ধে বিনোদ বার-দুয়াইরা ঘর॥
শীতলপাটী দিয়া বিনোদ ঘরের দিল বেড়া।
উলুছনে ছাইল চাল দেখতে মনহরা॥"[২৭]

দরিদ্ররা একটি বা দু'টি ঘরে বসবাস করত। অনেক সময় তাতে বাঁশ বা বেতের কারুকার্য করা হত। ঘর সংলগ্ন 'পিঁড়া' বা বারান্দা থাকত। গ্রামের অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকেরা বাঁশ ও কাঠের তৈরী বাসগৃহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিত। সেখানে মন্দির বা ঠাকুরঘর, রান্নাঘর, অতিথি অভ্যাগতদের জন্য মূল অন্তঃপুরের বাইরে কাছারি ঘর বা 'বার-বাঙ্গলা' বা 'বার-দুয়াইরা ঘর' থাকত। গৃহাভ্যন্তরে সরোবর থাকত, তাতে নামাওঠার জন্য শান বাঁধানো ঘাট থাকত। ধনীরা অনেকে ঘরের দেয়ালে ও দরজায় কাচ লাগাত, মণি-মুক্তা খচিত করত, গৃহে

নেতের পতাকা লাগাত, বাড়ীর চারিদিকে বাগান থাকত। প্রতিটি মনসামঙ্গলেই চাঁদ সদাগরের উদ্যানবাটী নির্মাণ প্রসঙ্গ আছে। কালকেতুর গুজরাট নগর স্থাপনায় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালীর গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার বিবরণ পাওয়া যায়। অবস্থাপন্ন বিলাসী লোকেরা গ্রীষ্মের উত্তাপ থেকে রক্ষার জন্য পুকুরের উপর জলটুঙ্গি নির্মাণ করে বসবাস করত। 'গোর্খবিজয়' কাব্যে হরগৌরীর জলটুঙ্গিতে বসবাসের চিত্র আছে।

মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য কাব্য থেকে দেখা যাচ্ছে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দরিদ্র, নিম্নবিত্তের গৃহনির্মাণ পদ্ধতির কোন তারতম্য ঘটেনি। অপর দিকে উচ্চবিত্তের লোকেরা, যারা গ্রামে বাঁশ-কাঠের তৈরী শৌখিন গৃহে বসবাস করত, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেই শ্রেণীর লোকেরা অনেকে নগরবাসী হয় এবং কোঠাবাড়িতে বসবাস করতে থাকে। রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী বিরচিত গোসানী মঙ্গলকাব্যে কান্তেশ্বরের জামবাড়ি নগর স্থাপন বনকেটে বসতি স্থাপন, তবে এটা ঠিক কালকেতুর গুজরাট নগর স্থাপন নয়, এখানে বাঁশ-কাঠ নির্মিত বাড়ীর পাশাপাশি কোঠাবাড়ি ছিল। এখানে উত্তরবঙ্গীয় গৃহনির্মাণ পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়।

খ) সংস্কার ও বিশ্বাস-কেন্দ্রিক উপাদানের বিবর্তন ঃ লোক-বিশ্বাস, লোক-সংস্কার ও লোকাচারগুলি কোন ব্যক্তি বিশেষের বিষয় যেমন নয়, তেমনি একটি কালের বিষয়ও নয়। বহু মানুষের বহু যুগের চিন্তা-চেতনার অভিব্যক্তি লক্ষ করা যেতে পারে এসবের মধ্যে। বাঙালী সমাজ এসমস্ত লোক-বিশ্বাস, লোক-সংস্কার ও লোকাচারের ভারে অনেক সময় ভারগ্রস্ত হয়ে পড়লেও এর মধ্যে দিয়ে বাঙালীর নিজস্বতা প্রকাশ পেয়েছে। প্রধানত নারী-কেন্দ্রিক হলেও ক্রমশ পুরুষও লোক-সংস্কার ও লোক-বিশ্বাসের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে বহু মানুষের বহু মানসের চিন্তা-চেতনা, কল্যাণ-অকল্যাণ, মঙ্গল-অমঙ্গল বোধ, দুঃখ-দারিদ্র্য পীড়িত জনমানসের আশ্রয়, শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ ঘটেছে এর মধ্যে দিয়ে। বাঙালী জনমানসে এই সব সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-আচরণের প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে। যুগ পরিবর্তনের ফলে অনেকক্ষেত্রেই পুরাতন সংস্কার-বিশ্বাস ও আচার-আচরণের স্থলে নতুন সংস্কার-বিশ্বাস ও আচার-আচরণ জন্ম নিয়েছে। পুরাতন ধ্যান-ধারণার প্রতি অবিশ্বাস ও অনাস্থা প্রকাশিত হয়েছে। আবার পুরাতন সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-আচরণ জনমানস থেকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে তা-ও নয়, সমাজের অভ্যন্তরে অন্তঃপ্রবাহি ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

দেখা যায় মধ্যযুগীয় বাঙালীর জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানান আচার-বিচার, সংস্কার-বিশ্বাসের নিগড়ে আবদ্ধ ছিল। পূর্বালোচিত অধ্যায়গুলিতে তার প্রচুর দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় মনসামঙ্গল থেকে চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন সব কাব্যেই প্রায় একই প্রকার সংস্কার-বিশ্বাস ও আচার বিচারের কথা পাওয়া যায়। যুগ পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোন কাব্যে আচার-বিচার ও সংস্কার বিশ্বাসের স্বল্পতা ও আধিক্য লক্ষিত হয়। তবে এসমস্ত উপাদান ও প্রয়োগগুলি সবই বাঙালী সমাজ থেকে এসেছে তা নয়; মুসলমান সমাজের আচার-বিচার যেমন হিন্দুসমাজে প্রবেশ করেছে তেমনি হিন্দুর কিছু কিছু আচার-বিচার মুসলমান সমাজে প্রবেশ করে গেছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান কবিদের দ্বারা রচিত সাহিত্যে এসব উপাদানের প্রয়োগ দেখে অনুমান করা যায় ঐ সময়ে হিন্দু-মুসলমান অনেক কাছাকাছি চলে এসেছিল তাই লোকাচার ও লোক-বিশ্বাসের আদান-প্রদান ঘটে গিয়েছিল।

সংস্কার-বিশ্বাসগুলিকে লক্ষ করলে কোন্ কোন্ বিষয়ে কি জাতীয় সংস্কার পালিত হত তা বোঝা যায়. যেমন– কৃষি বিষয়ক সংস্কার, গৃহনির্মাণ ও গৃহ প্রবেশ বিষয়ক সংস্কার, নতুন পোশাক পরিধান সম্পর্কিত সংস্কার. প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কিত সংস্কার. রোগ-ব্যাধি বিষয়ক সংস্কার, যাত্রা-অযাত্রা. মঙ্গল-অমঙ্গল বিষয়ক সংস্কার ইত্যাদি। কৃষি নির্ভর বাঙালী সমাজে শস্যরোপণ, ফসল কাটা ও ফসল ঘরে তোলা সম্পর্কিত আচার পালিত হত। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে শিবের চাষবাস আরম্ভের আগে ভূমিপূজা বা বসুমতীপূজার কথা আছে। অকুমারী ভূমিতে লাঙল দেওয়া নিষিদ্ধ বলেই ভূমিপূজা করা হত। আবার আষাঢ় মাসের প্রথম সাত

দিন জমিতে লাঙল দেওয়া নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গলে বা ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চণ্ডীমঙ্গলে এরকম সংস্কারের কথা পাওয়া যায় না। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে চাঁদের বাণিজ্যযাত্রার আগে পূর্ণঘট স্থাপন ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে নৌকা পূজার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌকা বহু মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় আজও গ্রামীণ বাঙালী সমাজে ভূমিপূজা ও নৌকাপূজা করা হয়ে থাকে। কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত শস্যরোপণ ও ফসল কাটা সম্পর্কিত বিভিন্ন আচারগুলি হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে পালিত হয়ে আসছে। মহালক্ষ্মীর ব্রত, ইতুলক্ষ্মীর ব্রত, নবান্ন উৎসব, পৌষলক্ষ্মীর ব্রত বা পৌষীকৃত্য কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন আচারের অন্তর্গত।

যাত্রা-অযাত্রা বা যাত্রাপথের শুভাশুভ ও মঙ্গল-অমঙ্গল সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্কার হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই পালিত হত। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে হিন্দুসমাজে বিভিন্ন সংস্কার পালিত হতে দেখা যায়। কাব্যে উল্লিখিত মুসলমান সমাজেও নির্দিষ্ট কতকগুলি সংস্কার পালিত হতে দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে এবং মুসলমান কবিদের রচিত কাব্যগুলিতে যেমন হিন্দুর পালিত সংস্কার দেখা যায়, তেমনি মুসলমান পালিত বিভিন্ন সংস্কারও দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যে যাত্রা-অযাত্রা সম্পর্কিত সংস্কারের উল্লেখ দেখা যায়। বলাই বাহুল্য সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এজাতীয় সংস্কার-বিশ্বাস আরও ভয়াবহভাবে বেড়ে গিয়েছিল, তাই পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কাব্যগুলি অপেক্ষা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে এসবের প্রয়োগ অনেক বেশী। হাঁচি পড়া, টিকটিকির ডাক শোনা, চোখে কানামাছি পড়া, মাথার উপর শকুনি ডাকা, মরা ডালে কাক বসা, কুইলা বলদ গোয়ালে রাখা, ঋণ করা, মদ্যপান করা, কালপেঁচা ডাকা, মেয়েদের মাথার উকুন বাছতে দেখা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র সংস্কার ছিল। তাছাড়া গ্রহ-নক্ষত্র, তিথি, বার, খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বাছবিচারও বেড়ে গিয়েছিল। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলমান কবিরা ইসলামী শাস্ত্রগ্রন্থ জাতীয় রচনা করেছিলেন, সেগুলিতে মুসলমান সমাজের নিজস্ব সংস্কার-বিশ্বাসের পাশাপাশি হিন্দুসমাজে পালিত সংস্কারও দেখা যায়।

পালিত বিভিন্ন আচার-বিচারগুলি, যেমন— ঋতুবতী রমণীও প্রসূতি বিষয়ক আচার ও সংস্কার, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুকালীন আচার হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে পালিত হত তাদের নিজস্ব রীতি অনুসারে। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে জন্ম-বিবাহ ও মৃত্যু সম্পর্কিত আচার বর্ণনা অনেক কম। হারীত, হলায়ুধ, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত পণ্ডিতগণ নবজাতকের বিভিন্ন রকম সংস্কারের কথা বললেও বাংলায় সামবেদীয় দশ-সংস্কার গৃহীত হয়। এগুলি হল— গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমন, অন্নপ্রাশন, চূড়াকর্ম, উপনয়ন ও বিবাহ। লক্ষণীয় বিষয়, মঙ্গলকাব্যগুলিতে এগুলি আনুপূর্বিক পালনের বিবরণ পাওয়া যায় না। অঞ্চলভিত্তিতে এই আচারগুলির পার্থক্য ছিল এবং কবিগণ নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকেই ঐতিহ্যগত সত্যকে তুলে ধরেছেন। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যে বিবাহাচারের বর্ণনা অনেক বেশী। আবার সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে পদ্মাবতীর বিবাহে বা লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল কাব্যে চৈতন্যদেবের বিবাহের লোকাচারের আনুপূর্বিক বর্ণনা আছে। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের সময়কালে সমাজ ছিল অধোগতি সম্পন্ন। কবি সমাজের মধ্যে প্রচলিত মূল্যবোধের দ্বারা সমাজ সংগঠন করতে চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ রায় কাব্যে পৌরাণিক আদর্শকে প্রচার করতে চাইলেও সামাজিক প্রভাবকে সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারেননি, তাই নারী সম্পর্কিত নানা বিধি- নিষেধগুলি তিনি তাঁর সমসাময়িক সমাজ জীবন থেকেই গ্রহণ করেছেন। সতী নারীর কি কি করণীয় এবং কি কি নিষেধ ছিল তার বিবরণ দিয়েছেন, যেমন— সতী নারীর পূর্ণ কলসীতে হাত দেওয়া নিষেধ, মালীর মালঞ্চ থেকে ফুল তোলা বা চুরি করা নিষেধ, অখণ্ড ক্ষেত্র থেকে শস্য ছিন্ন করা নিষেধ, বারুইয়ের বরজ থেকে পান নেওয়া, বন দাহন করা, গোটা কুমড়ো ছেদন করা, ভাদ্রমাসে চন্দ্রকলা

দেখা নিষেধ। কবির ভাষায়—

"পূর্ণ কলসীতে হাত না দিয়ে কুমারী।
মালীর মালঞ্চে পুষ্প না করহ চুরি॥
অখণ্ড ক্ষেত্রেতে কভু না ছিণ্ডিহ শস্য।
এই তিন কর্ম্মে হয় কলঙ্ক অবশ্য ॥
বারইয়ের বরজে কভুপান নাহি লুড়ি।
ত্রিস জাতি (?বিশ) হইয়া কভু বন নাহি পুড়ি॥
কুষ্মাণ্ড কাটিতে নাহি হইয়া অবলা।
ভাদ্র মাসে চন্দ্র না দেখিহ চারি কলা॥
এই সব কর্ম্মে লোক হয় অপরাধ।
ফলিল আমায় (এই) তিন অপরাধ॥ (রামকৃষ্ণ/১২১)

রামকৃষ্ণ রায় বলেছেন, এই কাজগুলি করলে লোক অপরাধ হয়। ভারতচন্দ্রের সময়কালে বাঙালী অনেকখানি বলিষ্ঠ ধ্যানধারণায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। তাই ঝাড়ফুঁক, তুক্-তাক্, বশীকরণ, মারণ-উচাটনের প্রয়োগ ভারতচন্দ্রের কাব্যে নেই, বরঞ্চ সে স্থান গ্রহণ করেছে কলা-কৌশল ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ। তাইতো সুন্দরকে ধরার জন্য কোন তুক্তাকের প্রয়োগ না করে কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। ধর্মীয় আচরণ অনেকাংশে হাস্যকর হয়ে উঠেছিল, তাই অন্নদামঙ্গলে ব্যাসদেবের ধর্মধ্বজী বেশভূষা ও আচরণ হাস্যকর। দেবদেবীর পূজাতিথি, বার-ব্রত অনেকাংশে অবহেলিত হয়েছিল। দেবদেবীর পূজাতিথি অপেক্ষা কামনা-বাসনা অধিক গুরুত্ব পেয়েছিল। তিথি, বার-ব্রত মানব জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। হিন্দুর বিবাহে সম্প্রদান, যজ্ঞ এবং সপ্তপদী ছাড়া সমস্তই লোকাচার মাত্র। কন্যার বিবাহে কুলশীলের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। মেয়েদের বিবাহ খুব অল্প বয়সে দেওয়া হলেও এসম্পর্কে নানা বিধিনিষেধ ছিল।শাস্ত্রকার মনু গুণহীন পাত্রে কন্যাদানের বিরোধিতা করলেও ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দন অবশ্য তা স্বীকার করেননি। এসময় মুসলমান শাসনকালে বাঙালীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের স্থিতিশীলতা নষ্ট হওয়ায় সে সময়কার স্মৃতিকারগণ অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ বিধিবদ্ধ করেন এবং পরবর্তীতে তা ক্রমশ প্রথায় পরিণত হয়েছিল। মঙ্গলকাব্যগুলিতে অল্প বয়সে কন্যার বিবাহদানের কথা পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া বয়স্থা কন্যা ঘরে রাখলে সামাজিক ভাবে অবরোধ করা হত।

হিন্দুসমাজে বিবাহের নানা প্রকার নিয়ম প্রচলিত ছিল। সাধারণত আট রকমের বিবাহ প্রচলিত ছিল, এগুলি হল— ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব, রাক্ষস, আসুর, পৈশাচ ইত্যাদি। মঙ্গলকাব্যগুলিতে সাধারণত ব্রাহ্ম বিবাহের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলেও সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য কাব্যে গান্ধর্ব, প্রাজাপত্য ও আসুর বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়।বোধহয় চৈতন্যযুগে ও তার পরবর্তীকালে বিভিন্ন জনসমাজ থেকে আগত লোকাচার বাঙালী হিন্দুর লোকাচারে প্রবেশ করে গিয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দী থেকে বৈষ্ণবসমাজে বিবাহ প্রথা অনেকটা জটিলতা মুক্ত হয় এবং কণ্ঠী বদল প্রথায় বিবাহ চালু হয়। হিন্দুসমাজে কণ্ঠী বদলের মত 'তুলসী বদল' প্রথা চালু হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ও জগজ্জীবন ঘোষাল বিবাহরীতিতে 'তুলসীবদল' প্রথার বর্ণনা করেছেন। শুধু তাই নয়, তামা-তুলসী স্পর্শ করে দুই পক্ষ বিবাহ ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হত।

মৃত্যুকালীন সংস্কারও হিন্দু-মুসলমান সমাজে আপন আপন প্রথা অনুযায়ী সম্পন্ন হত। বৈষ্ণব সমাজে মৃতদেহ দাহ করার পরিবর্তে সমাধি দেওয়ার প্রথা চালু হলেও হিন্দুর মৃতদেহ সৎকারে পরবর্তীকালে জটিলতা বৃদ্ধিই পেয়েছিল বলে মনে হয়। দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে চাঁদ সদাগরের পিতার মৃত্যুর পর প্রচুর অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে 'দানসাগর' শ্রাদ্ধ, জগজ্জীবনের কাব্যে 'বৃষোৎসর্গ' শ্রাদ্ধ করার উল্লেখ পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির

বিবরণ অনুযায়ী মৃত্যুর পর এক বৎসরকাল পর্যন্ত নানা বিধিনিষেধ পালনের কথা জানা যায়। এসব বিষয়ে হিন্দুসমাজ অনেকটা রক্ষণশীলতা পালন করেছিল। এখন প্রশ্ন হল ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তীকালে বিশেষত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংস্কার-বিশ্বাসের অতি বৃদ্ধির কারণ কি ? তুর্কী আক্রমণ বাঙালী সমাজে যে সচলতা নিয়ে এসেছিল তার সঙ্গে লড়াই করে প্রতি মুহূর্তে মানুষকে বাঁচতে হত - সুতরাং ভাববিলাসীতার স্থান কমে গিয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দী থেকে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়, এবং চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে এক শ্রেণীর মানুষ আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেও আরেক শ্রেণীর মানুষ পার্থিব ভোগবাদের দ্বারা ভাববিলাসী জীবনচর্যাকে আচ্ছন্ন করে তোলে। ফলে নানারকম আচার-বিচার বৃদ্ধি পায়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে দেশের স্থিতাবস্থা নষ্ট হলে নারীরা নিরাপত্তার কারণে গৃহবন্দি হয়ে পড়ে, ফলে আচার বিচারের নিগড়ে নারীকে আবদ্ধ করা হতে থাকে। আর নারীও নানা সংস্কার-বিশ্বাস ও আচার-বিচারে নিজের পরিমণ্ডল তৈরি করে নেয়। তাই দেখা যায় নতুন নতুন বিধিনিষেধের ব্যবহার যা পূর্ববর্তীকালে রচিত কাব্যে উল্লেখ নেই।

মধ্যযুগের প্রথম পর্ব থেকেই হিন্দুসমাজে ঘটক, দৈবজ্ঞ, ব্রাহ্মণ, সাধু, সন্ন্যাসীদের প্রভাব ছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাস্তবে ব্রাহ্মণের মর্যাদা হানি ঘটেছিল। তুর্কী আক্রমণের ফলে এদেশীয় সমাজব্যবস্থার উপরের স্তর থেকে ব্রাহ্মণের স্খলন ঘটেছিল। ব্রাহ্মণরা সমাজ রক্ষার মানসে আপন কর্তৃত্বকে বজায় রাখার জন্য হিন্দুসমাজ সংগঠনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাস্তবে ব্রাহ্মণ সমাজ আর কোনদিনই তাদের হৃত প্রতিপত্তি ফিরে পায় নি, কেননা পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল বণিক সম্প্রদায় সমাজের মধ্যমণি হয়ে পড়েছিল। তবে ষোড়শ শতাব্দী এমনকি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত বেদ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কারণে ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি কিছুটা ছিলই। তাই মুকুন্দের কাব্যে দেবরাজ কর্তৃক ভিখারী শিবের পূজা। শিবঠাকুর দেবরাজকে যে কথাগুলি বলেছিল —

"শুন শক্র তুমি তো স্বর্গের অধিকারী।
কিসের কারণে পূজ জনম ভিখারী॥
করহ আমারে ইন্দ্র কপট অর্চ্চনা।
কপট ভকতি করি কর বিড়ম্বনা॥" (মুকুন্দ / ৩২)

কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষী ও দৈবজ্ঞদের প্রতি মানুষে বিশ্বাস হ্রাস পেয়েছে। তাই জগজ্জীবনের কাব্যে দেখি বাণিজ্য যাত্রাকালে দৈবজ্ঞ নির্দেশ দিয়েছে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা কুশল নয়। চাঁদ সদাগর গণনায় আস্থা স্থাপন না করে দৈবজ্ঞকে বন্দি করার নির্দেশ দিয়েছে —

"ক্রোধে বোলে বানিয়া ব্রাহ্মণ বন্দী কর।
যাবত না আসি আমি চম্পালি নগর॥
সত্য হইলে আমি দিব পঞ্চ গ্রাম।
মিথ্যা হইলে তোমার করিব অপমান॥" (জগজ্জীবন/১২২)

ষোড়শ শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গলের কবি দ্বিজমাধবের কাব্যেই অর্থবান ধনপতির ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করার কথা পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণসমাজ হৃত প্রতিপত্তির গৌরব ভুলতে পারে নি। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে দেখা যায় ধনপতি সিংহলরাজকে বহুমূল্য সম্পদ উপঢৌকন দিয়েছে। যথাকালে অগ্নিশর্মা নামে পুরোহিত ব্রাহ্মণ তথায় উপনীত হয়। রাজার উপঢৌকন প্রাপ্তি এবং ব্রাহ্মণের বঞ্চনায় রুষ্ট হয়ে সে বলে —

"ইহা শুনি অগ্নিশর্ম্মা বলে অতি রোষে।
ব্রাহ্মণ বসতি কেন করে এই দেশে॥
বিধি ব্যবস্থার বেলা আমি প্রতিদিন।

কার্য কারণের কালে আমি উদাসীন॥

- - - - - - - - - - - - - - - -

এত বলি অগ্নিশর্ম্মা যায় সভা ছাড়ি।
প্রবোধ করিল পাত্র তার পায়ে পড়ি॥" (মুকুন্দ /১৬৩)

এই উক্তিতে ব্রাহ্মণের হৃত ক্ষমতার ক্ষোভ প্রকাশিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ সামাজিক ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। একারণেই অগ্নিশর্মা পুরোহিত পথের কুশলবার্তায় কমলেকামিনীর ফাঁদে ধনপতিকে কারারুদ্ধ করায়।শিবায়নে ব্রাহ্মণের পোদবৃত্তি অর্থাৎ কৃষিবৃত্তি গ্রহণ ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিনিধি শিবঠাকুরের ভাল লাগেনি; ভিক্ষাবৃত্তিকেই তাই শ্রেয় বলে মনে হয়েছিল। আসলে মধ্যযুগে ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি নিন্দনীয় ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে সমাজে ব্রাহ্মণের মর্যাদা প্রায় ছিল না। তাই শিবঠাকুরের আক্ষেপ—

"সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে॥" (ভারতচন্দ্র/৫৬)

শিবঠাকুরের উপলব্ধির কারণ কাঞ্চন কৌলীন্যের যুগে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ হলেও তার মূল্য নেই। অন্নপূর্ণা এখানে দেবী নয়, সে ধন-সম্পদ-ঐশ্বর্য্য। তাই নলকূবর অন্নপূর্ণার পূজাতিথি উপেক্ষা করে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাকে মূল্য দেয়। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশিনী দেবী নিজে নলকূবরের কাছে জবাব পেয়েছে-

"অন্নদা যেমন কতেক তেমন
আছয়ে মোর ভাণ্ডারে॥
শঙ্কর ভিখারী সে ত তারি নারী.
আমি মর্ম্ম জানি তার।
বাপার ভাণ্ডারে অন্ন চাহিবারে
দিনে আসে তিন বার॥
কি বলে বামণ অরে চরগণ
বধ রে ইহার প্রাণ।" (ঐ/১৫২)

'ব্রাহ্মণ অবধ্য' এই আপ্তবাক্যটিও অষ্টাদশ শতাব্দীতে নষ্ট হয়েছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে দক্ষ শিব নিন্দায় শিবের যে পরিচয় উপস্থাপিত করেছে সেটা ঐতিহাসিক সত্য। দক্ষের সঙ্গে শিবের দ্বন্দ্ব এখানে ধর্ম দ্বন্দ্ব নয়, আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বও নয়, বড় হয়ে উঠেছে সামাজিক কৌলীন্যের দ্বন্দ্ব। দক্ষ এখানে শিবঠাকুর সম্পর্কে বলেছে-

"কি জাতি কে জানে কারে নাহি মানে
সদা কদাচারময়॥
কহিতে ব্রাহ্মণ কি আছে লক্ষণ
বেদাচারবহিষ্কৃত ।
ক্ষত্রিয় কথন না হয় ঘটন
জটা ভস্ম আদি ধৃত॥
যদি বৈশ্য হয় চাষী কেন নয়
নাহি কোন ব্যবসায়।
শূদ্র বলে কেবা দ্বিজ দেয় সেবা
নাগের পৈতা গলায়॥
গৃহী বলা দায় ভিক্ষা মাগি খায়

না করে অতিথিসেবা।"(ঐ/২০)

অর্থ ও গুণের বিচারে শূদ্র ও দরিদ্র সমাজে মর্যাদা পেতে শুরু করেছিল। কবিকঙ্কণের কাব্যে দেখা যায় দেবরাজ কর্তৃক ভিখারী শিবের পূজা। ব্রাহ্মণ হিসাবে ভিখারী শিব পূজা পেলেও অষ্টাদশতাব্দীতে সে অবহেলার পাত্র হয়ে উঠেছিল। তবে সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে নতুন নতুন শূদ্র জাতির উদ্ভব হয়েছিল।

মুসলমান সমাজেও পীর, ফকির, দরবেশদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে হিন্দুরা যেমন মুসলমান পীর, দরবেশদের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা পোষণ করতে থাকে মুসলমানরাও অনেকক্ষেত্রে হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেছিল। তুর্কী আক্রমণের অতর্কিত বিপর্যয়ে বিপন্ন হিন্দুসমাজ দৈববাদী হয়ে পড়েছিল, তেমনি ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে মুসলমান নবাবদের শাসন সম্পর্কে শৈথিল্য, বর্গী আক্রমণ, পলাশীর যুদ্ধ সমস্ত বিপর্যয় মিলে বাংলাদেশের সমাজকে বিপর্যস্ত করে। নাগর সমাজ ভোগবিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারীতার গভীরে নিমজ্জিত হয়, এমতাবস্থায় মুসলমান সমাজও আত্মশক্তি হারিয়ে অদৃষ্ট নির্ভর হয়ে পড়েছিল। একারণে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে পীর, দরবেশদের প্রতি আস্থা স্থাপন করে কাব্য রচিত হতে থাকে, ফলে হিন্দুরা শুধু জগজ্জননীকে আশ্রয় করেই ক্ষান্ত হয়নি সত্যপীরকে সত্যনারায়ণে, বড়গাজী খাঁকে বাঘদেবতা সোনা রায়ে পরিণত করেছে। সুতরাং শুধুমাত্র ধর্ম সমন্বয়ের মানসিকতা থেকে এসব দেবতার সৃষ্টি সম্ভব হয়নি; এর মূলে দৈববাদী, আচার সর্বস্ব মানসিকতা সক্রিয় ছিল। এসমস্ত পরিবর্তনগুলি আচার-আচরণ, সংস্কার-বিশ্বাসের পরিবর্তন বা বিবর্তন বলে মেনে নেওয়া চলে।

গ) ভাব-কেন্দ্রিক উপাদানের বিবর্তন ঃ বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তনে শিক্ষা-সংস্কৃতিরও বিবর্তন ঘটেছিল, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য কাব্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেকালে টোল, চতুষ্পাঠী ও পাঠশালা-কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রচলিত থাকলেও আশ্রমিক শিক্ষাও প্রচলিত ছিল। ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্তী স্বয়ং গুরুগৃহে থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন। মুসলমানরা মক্তব ও মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করত। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদ্যোৎসাহীরা নদীয়া, শান্তিপুর, চট্টগ্রাম অঞ্চলে যেত। ঐ স্থানগুলি ছিল উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে ঐ স্থানগুলি উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম, দর্শন ও শিক্ষা-সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে নবদ্বীপের যে গুরুত্ব সৃষ্টি হয়েছিল শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর এই গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। তবে সপ্তদশ শতকেও উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র রূপে নবদ্বীপের গৌরবোজ্জ্বল ধারা যে অব্যাহত ছিল তার কথা জানা যায় রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্য থেকে। কবি নিজের শিক্ষা প্রসঙ্গে সেকালের শিক্ষাকেন্দ্র শান্তিপুর, নবদ্বীপ ও জউগ্রামের কথা বলেছেন, এবং সেকালের কয়েকজন খ্যাতনামা অধ্যাপকের নাম করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে বর্ধমানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বর্ধমান শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভের জন্য বর্ধমান আসত। রামপ্রসাদ সেন বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সুন্দরের মুখে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বর্ধমানের এই ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা বলেছেন।[২৮] মধ্যযুগের শিক্ষণীয় বিষয়ের বিস্তৃত তালিকা পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যগুলিতে, তবে সেকালে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন ছিল না বলেই বোধ হয়, পঞ্চদশ-ষোড়শ বা তারও পরবর্তীকালের সাহিত্যেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তবে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষয়িক প্রয়োজনে জীবিকার সহায়ক যুগোপযোগী শিক্ষা চালু হতে চলেছিল, বিশেষত ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। মোগল যুগে সরকারি ভাষা ছিল ফারসী, ফলে সামাজিক মর্যাদা ও জীবিকার প্রয়োজনে ফারসী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি আরবী, ফারসী, উৎকল প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত, সংস্কৃত বা নাগরী ভাষার মর্যাদা ও মূল্য হ্রাস পেতে থাকে। মঙ্গলকাব্যের তথ্যানুযায়ী— ফারসী ভাষা না জানলে সামাজিক ভাবে তিরস্কৃত হতে হত। ভারতচন্দ্র ফারসী না শেখার জন্য ভ্রাতাগণের নিকট

তিরস্কৃত হয়ে রামচন্দ্র মুন্সীর নিকট ফারসী ভাষা শিখেছিলেন। আবার ঘনরাম চক্রবর্তী স্বয়ং আরবী, ফারসী ভাষা শিখেছিলেন বলে জানা যায়।[২৯] জনমানসের আকাঙ্ক্ষার গভীরে অর্থকরী ফারসী ভাষা শিক্ষা কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় সেঁজুতি ব্রতের মন্ত্রে। কুমারী ব্রতীর কামনা বাস্তব প্রয়োজনকে অতিক্রম করে বেশী দূর যেতে পারেনি। তাই ব্রতী প্রার্থনা করে—"আরশি আরশি আরশি/আমার স্বামী পড়ুক ফার্সি।"[৩০] অন্যান্য সূত্র থেকেও আরবী, ফারসী ভাষা শিক্ষার গুরুত্বের কথা পাওয়া যায়।

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে শিক্ষার ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় ভাষা ছিল যথাক্রমে সংস্কৃত ও আরবী। ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন ও শিক্ষার জন্য শিক্ষা দেওয়া হত; যদিও শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ ও ধর্মীয় ভাষা শিক্ষার অধিকার সকলের ছিল না। চৈতন্য-পরবর্তীকালে সামাজিক মর্যাদা ও জীবিকার তাগিদে, রাজানুগ্রহলাভে ঐ সমস্ত ভাষা শেখানো হত। তাছাড়া জীবিকা অর্জনের সহায়ক হিসাবে লোক-সমাজে কবিরাজি, ধন্বন্তরীবিদ্যা, সর্পবিষনাশ, হেকিমী শিক্ষার কথা পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত এসমস্ত শিক্ষার গুরুত্ব ছিল। তাছাড়া পুথিগত শিক্ষা ছাড়াও চিত্র শিল্প, কারুশিল্প, সূচীশিল্পে নারীপুরুষ উভয়েই দক্ষতার পরিচয় দিত। নৃত্যগীত চর্চায় সেকালের নারীরা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিত। মনসামঙ্গলে বেহুলা, চণ্ডীমঙ্গলে রত্নমালা, ধর্মমঙ্গলে সুরিক্ষা, ভারতচন্দ্রের কাব্যে রাজকুমারী বিদ্যা ও তার সখীদের নৃত্যগীতে পারদর্শিতার কথা পাওয়া যায়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে নারীর নৃত্যগীত চর্চায় ভাঁটা পড়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন— "যে সকল শিল্পকলায় প্রাচীনকালে নারীর প্রাধান্য ছিল তাহাও কালক্রমে লোপ পাইল। মধ্যযুগের শেষভাগে এইসব বিদ্যা কেবল গণিকারাই চর্চা করিত। কোনো ভদ্র পরিবারের মহিলাদের এই সব শিক্ষা কল্পনারও অতীত ছিল।"[৩১] বস্তুতপক্ষে এই বক্তব্যকে অস্বীকার করা যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেহুলার নৃত্যগীত চর্চার কথা থাকলেও ষোড়শ শতাব্দীর প্রধান কাব্য চণ্ডীমঙ্গলে রত্নমালা স্বর্গীয় নর্তকী, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রধান কাব্য ধর্মমঙ্গলে বারবনিতা সুরিক্ষা, গোপীচন্দ্রের গানে হীরা নটীর নৃত্যগীত চর্চার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যে রাজকুমারী পদ্মাবতীর নৃত্যগীতের প্রসঙ্গ থাকলেও তা রাজ-অন্তঃপুরেই সীমাবদ্ধ দেখা যায়। মূলত গণিকারাই নৃত্যগীত পরিবেশন করত। পদ্মাবতীর বিবাহে দেখা যায় –

"নৃত্যগীত আনন্দে বাজায় পুণ্য দেশ।
নাচে বেশ্যা নৃত্যকালে মনোহর বেশ॥"[৩২]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যাসুন্দর কাব্যে রাজকুমারী বিদ্যাও সখীদের নৃত্যগীতে পারদর্শিতার কথা থাকলেও তা অভিজাত অন্তঃপুরেই সীমাবদ্ধ দেখা যায়। বস্তুত রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক কারণেই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে নারীরা আবার খানিকটা অন্তঃপুরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, ফলে নৃত্যগীত ও শিল্প চর্চায় ভাঁটা পড়েছিল এবং সেই জায়গা দখল করে নেয় গণিকা ও বারবনিতারা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবিগান, ঝুমুর, খেউর, খেমটা একান্তভাবেই দেহোপজীবী গণিকাদের বৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

মধ্যযুগে শিক্ষায় যেহেতু রাষ্ট্রের ভূমিকা থাকত না, তাই শিক্ষকের অবস্থাও ছিল শোচনীয়। তাঁরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেই সামান্য দু-এক টাকা ব্যতীত চাল, ডাল, তরিতরকারি পেতেন। ধনী পৃষ্ঠপোষকের নিকট থেকে তাঁরা অনেক সময় উচ্চহারে বেতন পেতেন. অনেকে গৃহশিক্ষক হিসাবে জমিদার বা সম্ভ্রান্ত ধনীর বাড়িতে থাকতেন। সেকালে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের মত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মনসামঙ্গলে পাঠশালার শিক্ষক সোমাই পণ্ডিতের কথা এবং ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে শ্রীমন্তের পাঠশালার শিক্ষকের কথা পাওয়া যায়। বিজয় গুপ্তের কাব্যে সোমাই পণ্ডিতের সঙ্গে তার শিক্ষার্থীদের মধুর সম্পর্কের চিত্র যেমন পাওয়া যায় তেমনি চণ্ডীমঙ্গলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতির কথা জানা যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে শিক্ষকের নৈতিক চরিত্রের হানি ঘটেছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে যাই হোক, সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ সত্ত্বেও শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট

আগ্রহ ছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে চাকুরী ও বৈষয়িক প্রয়োজনেই শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়েছিল বলে মনে হয়।

ঘ) বাক্-কেন্দ্রিক উপাদানের বিবর্তন ঃ বাক্-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির মধ্যে প্রথমে আসে প্রবাদ-প্রবচনের কথা। প্রবাদ-প্রবচনগুলি একটি জাতির দীর্ঘকালের ব্যবহারিক জীবন অভিজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ। এগুলি একদিক থেকে যেমন প্রাচীন তেমনি আধুনিক।[৩৩] সমাজজীবনের অভ্যন্তর থেকে প্রবাদের জন্ম, সমাজ জীবন পরিবর্তনের সঙ্গে তাই প্রবাদসমূহেরও পরিবর্তন হয়ে থাকে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন– "প্রবাদ মাত্রই সমাজ জীবনে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইজন্য সমাজ জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রচলিত বিষয়মূলক প্রবাদও পরিত্যক্ত হয়; কিন্তু তাহা পরিবর্তিত ও নূতন সমাজের উপযোগী করিয়া কমই লওয়া হয়।"[৩৪] দেখা যাচ্ছে চর্যাপদ থেকে যে সমস্ত প্রবাদ প্রচলিত ছিল তার মধ্যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কিছু কিছু প্রবাদ অন্য ভাষায় অন্য ভাবে রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু অনেক প্রবাদ লুপ্ত হয়ে গেছে এবং কালে কালে নতুন প্রবাদের উদ্ভব হয়েছে। যুগের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে প্রবাদেরও বিনষ্টিকরণ ঘটে। ডঃ ভট্টাচার্য আরও বলেছেন– "পরিবর্তনশীল সামাজিক জীবনের নূতন প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কোন প্রবাদই সংস্কার লাভ করিয়া আত্মরক্ষা করিবার প্রয়াস পায় না; ইহারা লুপ্ত হইয়া গেলেও পরিবর্তিত হয় না, বরং তাহাদের পরিবর্তে নূতন প্রবাদের উদ্ভব হইতে পারে।"[৩৫] কিছু প্রবাদ অবশ্য প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রচলিত, ইহারা প্রাচীন প্রবাদেরই আধুনিক রূপ মাত্র। সামাজিক মূল্যবোধ, আচার-বিচার, এক কথায় জীবনের সর্বাঙ্গীন রূপ যা একই ভাবে বর্তমান অবধি প্রচলিত সে সমস্ত বিষয়ে রচিত প্রবাদই আধুনিক রূপে প্রচলিত থাকে অন্যগুলি লোপ পায়। মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রবাদ-প্রবচনের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং লক্ষ করা যায় সমগ্র মধ্যযুগে একই প্রবাদ একটু ভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন কবিরা ব্যবহার করেছেন। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালী সমাজ চরিত্র যে প্রায় একই রূপ ছিল এই প্রবাদ-প্রবচনগুলি তা প্রমাণ করে।

বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে যে প্রচুর প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার করা আছে সেগুলি পাশাপাশি রেখে বিচার করলে সমাজ বিবর্তনের ছকটি আরও সুস্পষ্ট হবে। প্রবাদ-প্রবচনগুলি দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বস্তুনিষ্ঠ উপকরণ, যার মধ্যে দিয়ে পরিবর্তিত কালের প্রচ্ছন্ন ছবি পাওয়া সম্ভব। যেমন একটি বিশিষ্ট প্রবাদ পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বিজয় গুপ্ত ব্যবহার করেছেন - 'দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন'। ষোড়শ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গলের কবি দ্বিজমাধব বলেছেন - 'বিধির নির্ব্বন্ধ কভো না যায় খণ্ডন'। সপ্তদশ শতাব্দীতে এসে রূপরাম চক্রবর্তী লিখেছেন - 'কপালের লেখা তার না যায় খণ্ডন' এবং শিবায়নের কবি রামকৃষ্ণ রায় লিখেছেন - 'সাগর শুকাল্য মা গ কপালের দোষে'। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রও একই কথা বলেছেন ভিন্ন ভাষায় - 'ভবিতব্যং ভবিত্যেব খণ্ডিতে কে পারে'। তাহলে দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ চার'শ বছর ধরে বাঙালী সমাজ অদৃষ্টবাদী থেকে গেছে। কখনো 'দৈব', কখনো 'বিধি' কখনো বা 'কপাল' আবার কখনো 'ভবিতব্য' এই ব্যবহারে সূক্ষ্ম পরিবর্তন কি লক্ষ করা যায় না। দৈব → বিধি → কপাল → ভবিতব্য, দৈব থেকে বিধাতার বিধানে, তা থেকে নিজের ভাগ্য বা কপাল এবং ভবিতব্য বা ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথা অদৃষ্টবাদী বাঙালীর চিন্তার সামান্য পরিবর্তন চিহ্নিত করে। ভারতচন্দ্রের মত কবি যিনি দেবতাকে নিয়ে তামাশা করেন, তিনি দেবতার উপর নির্ভর করতে পারেন না, তাই কর্মতৎপরতায় তাঁর আস্থা, কিন্তু ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত - তা খণ্ডন করা যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গলের কবি দ্বিজ রামদেব ব্যবহৃত দু'টি প্রবাদ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য - ১। 'বীর বোলে দুঃখ সুখ কর্মের অধীন'। ২। 'সুখ দুঃখ যত হয়ে কর্মের অধীন'। এই প্রবাদ দু'টিতে অদৃষ্ট অপেক্ষা কর্মতৎপরতার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বাঙালী সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে, নারী পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে বহু প্রবাদ গড়ে উঠেছিল। নারী ছিল পুরুষের উপর একান্ত নির্ভরশীল। তাই বিজয় গুপ্ত লিখেছেন - 'স্বামী না থাকিলে নারীর জীবন কুৎসিৎ'।

দ্বিজমাধব লিখেছেন - 'পতি ছাড়ি গতি নাই স্ত্রী ধর্ম হইয়া'। মুকুন্দ চক্রবর্তীর ফুল্লরার উক্তি তো অবিস্মরণীয় - 'স্বামী বনিতার পতি / স্বামী বনিতার গতি / স্বামী বনিতার বিধাতা'। ততখানি স্বামী নির্ভরতা কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যবহৃত প্রবাদে পাওয়া যায় না। ঘনরাম যদিও উল্লেখ করেছেন - 'স্বামী বিনা সংসারে নারীর নাই গতি'। তবুও পুরুষসমাজও যে নারীর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে তা বেশ বোঝা যায়, যদিও তা ঊনবিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে নয়। বিপ্রদাস অনেক আগেই উল্লেখ করেছিলেন - 'আপদে বনিতা বিনা নাহিক সহায়'। কিন্তু ঘনরাম বলেছেন - 'নারীহীন পুরুষ পেয়েছে বড় দাগা / সহজে হইবে বলে সোনায় সোহাগা'। ভারতচন্দ্র আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে বলেছেন - 'নারী যার স্বতন্তরা তার সে জীয়ন্তে মরা' ইত্যাদি। সমাজ ইতিহাসের চেতনাগত বিবর্তন এই প্রবাদগুলি প্রমাণ করে। নারীপুরুষের সম্পর্ক নিয়েও বহু প্রবাদ গড়ে উঠেছিল। নারীকে সকল অনিষ্টের কারণ বলে ভাবা হত। সমাজের বিভিন্ন অনুষঙ্গ - পুরুষের বহুবিবাহ, সপত্নী সম্পর্ক, বিমাতা ও সন্তানের সম্পর্ক নিয়ে অনেক প্রবাদ আছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক ও জাতিবৃত্তিগত ভাবনা নিয়ে, যেমন - 'পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল', কিম্বা 'বাণিজ্যে বসেন লক্ষ্মী' কিম্বা 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাষ' ইত্যাদি অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে ব্যবহৃত কয়েকটি বিশিষ্ট প্রবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষের ব্যক্তিত্ব চেতনার উন্মেষকে প্রমাণ করে। যেমন - 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন', 'মাতঙ্গ পড়িলে দড়ে পতঙ্গ প্রহার করে', 'খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত', 'যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন' ইত্যাদি। 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়' – ধর্ম সম্পর্কে মানুষের অনাস্থা প্রমাণ করে। মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় মানুষ জীবন সম্পর্কে উদাসীন ছিল। মানব জীবন অপেক্ষা জাতি-ধর্মকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত। কিন্তু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যগুলিতে অনেক বেশী বাস্তব জীবন ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি জগজ্জীবন ঘোষাল জনৈক বৃদ্ধার মুখে তাই শুনিয়েছেন - 'প্রাণ হৈতে জাতি নাহি বড়।' ভারতচন্দ্র এ বিষয়ে আরো অগ্রণী।তিনি বলেছেন - 'ভবিষ্যত ভাবি কেবা বর্তমানে মরে'। তেমনি জীবনে অর্থের গুরুত্ব উপলব্ধিও গুরুত্বপূর্ণ সমাজ বিবর্তনের পরিচয় বহন করে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রচুর প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার আছে, তবে প্রবাদগুলি ভারতচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি না লৌকিক প্রবাদ বাক্যকে তিনি সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন তা বলা শক্ত। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ভারতচন্দ্র ব্যবহৃত প্রবাদগুলি সম্পর্কে বলেছেন – "ভারতচন্দ্র যে-সকল প্রবাদ তাঁহার কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাদের কোনও আধুনিক লৌকিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায় না, অতএব ইহারা তাঁহার মৌলিক রচনা হওয়া অসম্ভব নহে।"[৩৬] ভারতচন্দ্র ব্যবহৃত প্রবাদবাক্যগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাব পরিবেশে সৃষ্ট হওয়া সম্ভব। কেননা প্রবাদবাক্যগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। এই প্রবাদগুলির মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষের ব্যক্তিত্ব চেতনার স্পর্শ পাওয়া যায়। ব্যক্তিত্ববোধের জাগরণ না ঘটলে এ ধরনের বাক্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয় বলে মনে করা যেতে পারে। কবিগণ সমাজের ভিতর থেকেই প্রবাদগুলি সংগ্রহ করুন কিম্বা নিজেই সৃষ্টি করুন, পরিবর্তিত কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই যে প্রবাদগুলির সৃষ্টি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে ছড়া ও ধাঁধাঁর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ছড়াগুলির উদ্দেশ্য ও ভাব যাই হোক না কেন, দেখা যায় সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ রেখেই ছড়াগুলি তৈরী। মঙ্গলকাব্যগুলির কোন কোন অংশে ছড়ার স্বাদ আছে, তাছাড়া মঙ্গলকাব্যের সীমিত ক্ষেত্রের বাইরে স্বাধীনভাবে প্রচুর ছড়া গড়ে উঠেছিল। আধুনিক কালে সংগৃহীত এই ছড়াগুলিতে ক্রমবিবর্তনের পরে হয়ত উদ্ভবকালের রূপ বজায় নেই কিন্তু পরিবর্তিত কালের রূপটি তার মধ্যে ধরা পড়ে। কেননা সমকালীন সমাজ জীবনের নানান উপকরণ— সংস্কৃতি, প্রচলিত রূপকথা, উপকথা, জীবনচর্যার নানা বিষয়ে এই ছড়া রচিত হয়, যার মধ্যে সমাজ ইতিহাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যেমন – ঘুমপাড়ানি ছড়ার কথা বলা যেতে পারে। মুকুন্দ চক্রবর্তী শ্রীমন্তের বাল্যকথা বর্ণনায়

ঘুমপাড়ানি ছড়া বা ছেলেভুলানো ছড়া বলেছেন খুল্লনার মুখে। তার মধ্যে মুকুন্দের সমকালীন সমাজ ইতিহাসের কিছু কিছু উপকরণ পাওয়া যায়। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের সীমিত ক্ষেত্রের বাইরে যে সমস্ত ছেলেভুলানো ছড়া গড়ে উঠেছিল তার সংখ্যা প্রচুর এবং ছড়াগুলির মধ্যে দিয়ে পরিবর্তিত কালের ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ছেলেভুলানো' ছড়া প্রবন্ধে বলেছেন— "ইহারা অতীত কীর্তির ন্যায় মৃতভাবে রক্ষিত নহে। ইহারা সজীব, ইহারা সচল; ইহারা দেশকালপাত্রবিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে।"[৩৭] রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যই প্রমাণ করে সমাজ ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছড়াগুলিও পরিবর্তিত হয়েছে, তার মধ্যে ব্যবহৃত উপকরণের পরিবর্তন হয়েছে। যেমন বর্গী হাঙ্গামা বিষয়ক প্রচলিত ছড়াটি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য পর্বের পূর্বে গড়ে উঠতে পারে না। ছড়াটি হল –

"ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিবে কিসে,
ধান ফুরুল পান ফুরুল খাজনার উপায় কি?
আর কিছুকাল সবুর কর রসুন বুনেছি।"[৩৮]

ছড়াটিতে বর্গী আক্রমণের বিভীষিকার কথা এবং বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার কথা আছে তা ঐতিহাসিক সত্য। বর্গী আক্রমণের বিভীষিকার কথা বলে মা দুষ্টু ছেলেদের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াত। আবার ধর্মমঙ্গল কাব্যে মহামদ কর্তৃক প্রেরিত চোর ইন্দামেটে শিশু লাউসেনকে অপহরণ করতে গিয়ে নগরবাসীকে নিদ্রালি মন্ত্রে ঘুম পাড়াচ্ছে, মন্ত্র টি একটি ছড়া ছাড়া কিছু নয়; এর বিষয়বস্তু মধ্যযুগীয় ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস। জলপড়া, তেলপড়ার মতে ধুলোপড়া বিচিত্র কিছু নয়। সুতরাং ছড়াটিতে মধ্যযুগীয় আচরণগত বিশ্বাস ফুটে উঠেছে। আবার ধর্মমঙ্গলে ডোম সৈন্যদের বীরত্বগাথা সুবিদিত; একটি প্রচলিত ছড়ায় ডোম সৈন্যদের বীরত্বের কথা আছে।ছড়াটি হল—
"আগড়ুম বাগড়ুম ঘোড়াড়ুম সাজে / ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে।"[৩৯] ইত্যাদি। অতীতের ডোম সৈন্যদের বীরত্বের পাশাপাশি সেকালের জীবনের নানা উপকরণ ছড়াটিতে পাওয়া যেতে পারে। এই ভাবে দেখা যেতে পারে বিভিন্ন সময়ে, যেমন পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পতনকে কেন্দ্র করে বহু ছড়া রচিত হয়েছিল— ছড়াগুলি সংগ্রহ করে তার মধ্যে দিয়ে অষ্টাদশ শতকের পরিবর্তিত কালের রূপকে পাওয়া যেতে পারে। ধাঁধাঁগুলি সম্পর্কে একই কথা বলা যেতে পারে, সমকালীন ইতিহাসের খুঁটিনাটি উপকরণ অবলম্বন করেই তা গড়ে উঠেছিল সুতরাং জীবনযাত্রা, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন ধাঁধাঁ-র উৎপত্তি হতে থাকে।

ক্রীড়া-কেন্দ্রিক উপাদানের বিবর্তন : স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চা-কেন্দ্রিক উপকরণগুলির মধ্যে মঙ্গলকাব্যগুলিতে লোকক্রীড়ার উল্লেখ পেলেও সমগ্র মধ্যযুগে ঐ সমস্ত ক্রীড়াগুলিই প্রচলিত ছিল। বিপ্রদাস, মুকুন্দ চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁদের কাব্যে যে সমস্ত ক্রীড়ার উল্লেখ করেছেন পরবর্তীকালে রামপ্রসাদ সেনের শাক্ত পদাবলীতে ঐ সমস্ত লোকক্রীড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইংরেজদের আগমনের পূর্বে এদেশে নতুন ক্রীড়া প্রচলিত হয়নি বলেই মনে হয়। বস্তুত ক্রীড়া ও স্বাস্থ্যচর্চা, শরীরচর্চা সাধারণ বাঙালী সমাজে খুব একটা প্রচলিত ছিল বলে মনে হয় না। মঙ্গলকাব্যগুলিতে তাই এর ব্যবহারও অত্যন্ত কম।

২) সামাজিক অবস্থাগত বিবর্তন : মঙ্গলকাব্যের বিবর্তনের ধারায় বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের বহিরাঙ্গিক উপাদানগুলি ছাড়াও আভ্যন্তরীণ গঠনের বিবর্তনও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মনীতির ক্ষেত্রে মোটামুটি পরিবর্তনগুলি ধরা যেতে পারে। সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান, বাঙালীর পারিবারিক গঠন ও আদর্শবোধ, জাতিবৃত্তিগত পরিবর্তন এবং সর্বোপরি মধ্যযুগীয় বাঙালীর চরিত্রগত পরিবর্তনটিও মঙ্গলকাব্য থেকে মোটামুটি অনুধাবন করা যেতে পারে।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগীয় নারীর অবস্থানগত পরিবর্তন খুব একটা ঘটেছে তা

নয়; তবে কালগত পরিপ্রেক্ষিতে তার অবস্থানগত সত্যতা ফুটে উঠেছে। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারী অন্তঃপুরচারিণী, গৃহবন্দি। অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের অভ্যন্তরেই তার কামনা- বাসনা নির্বাপিত হয়েছে, আশা-আকাঙ্ক্ষা সমাহিত হয়েছে। তাই ব্রতের নারী দেবীর কাছেই তার ক্ষুদ্র নিতান্তই জাগতিক কামনা-বাসনা নিবেদন করেছে। তার মধ্যে থেকেই পারিবারিক কল্যাণ, শান্তি কামনা করেছে। গৃহাভ্যন্তরে বন্দি বলেই সমাজে ও পরিবারে নারীর অবস্থান অত্যন্ত সঙ্কুচিত ছিল। যত্রতত্র যাওয়া-আসা বিধিনিষেধের নিগড়ে আবদ্ধ ছিল, তাই দেখা যায় উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ সমাজের নারীকে বাইরে যাবার জন্য বার বার ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছে। নিম্নবর্ণের সমাজে নারীর অবস্থান এতটা সঙ্কুচিত ছিল না, তাই পুরুষের সঙ্গে তারা অর্থ উপার্জনে অংশ গ্রহণ করতে পারত। ব্রাহ্মণ সমাজেও বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর এই বাধা ছিল না। একারণেই মঙ্গলকাব্যের দেবীরা হয় নিম্নবর্ণের নারী ডোমনী বা বাগদিনী বেশ ধারণ করেছে অথবা বিধবা ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। এবিষয়ে মনসামঙ্গল থেকে অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত দেখা যায় মনসামঙ্গলে মনসাকে যতবার ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়েছে চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডীকে ততবার ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়নি, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন ও অন্নদামঙ্গলে আরও কম। বস্তুত সমাজব্যবস্থায় নারীর অবস্থানগত সামান্য পরিবর্তনই এই প্রবণতার কারণ বলে ধরা যেতে পারে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দুসমাজ 'কমঠবৃত্তি' অবলম্বন করেছিল। অতর্কিত আক্রমণে দিশাহারা ব্রাহ্মণ্যশাসিত হিন্দুসমাজে পুরুষরাই দিশাহারা হয়ে দৈববাদী ও আত্মশক্তি রহিত হীনবল হয়ে পড়েছিল। অপরদিকে নিস্তরঙ্গ হিন্দুসমাজ ছিল কর্মবিমুখ, ভাববিলাসী, ফলে নারীকে সুরক্ষা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। একারণে নারী গৃহবন্দি হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সামাজিক প্রয়োজন বা অর্থনৈতিক কারণে নারীকে ছদ্মবেশ ধারণ করে বাইরে যেতে হত। তাছাড়া পুরুষশাসিত সমাজ একালে নানা বিধিনিষেধের নিগড়ে আবদ্ধ করে নারীকে গৃহবন্দি হতে বাধ্য করেছিল। এক রাত্রির জন্যও নারী বাড়ির বাইরে নির্বাহ করতে পারত না। পথঘাটও নারীর পক্ষে যেমন নিরাপদ ছিল না তেমনি যত্রতত্র নারীকে পুরুষের লালসার শিকার হতে হত, ফলে নারীর ঘরের বাইরে যাবার উপায় থাকত না। মনসামঙ্গলে বেহুলার দেবলোক যাত্রাকালে পথের বিঘ্ন একথা প্রমাণ করে। ষোড়শ শতাব্দীতে এসে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হলে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ফলে নারী খানিকটা মুক্ত হয়। চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম জাতপাতের ব্যবধান তুলে সমাজকে অনেকখানি মুক্তি দিতে পেরেছিল ফলে পুরুষের পাশাপাশি নারীও ধর্মাচরণে নিযুক্ত হয়েছিল। তারা মুক্তাঙ্গনে দলবদ্ধভাবে কীর্তন করার অধিকার লাভ করেছিল। বৈষ্ণবীয় সাধনতত্ত্বে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়িনী শক্তিতে পরিণত হয়, তাই ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতে নারী শ্বাসরোধকারী পরিবেশ থেকে অনেকখানি মুক্তিলাভ করে। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু কাহিনীতে ব্যাধ সমাজের দেবী চণ্ডী গোধিকা রূপ ধারণ করে শেষে কালকেতুকে বর দিতে তার গৃহে উপস্থিত হল, ফুল্লরার সঙ্গে কথোপকথনে বোঝা যায় দেবী আসলে উচ্চবর্ণের গৃহবধূ। উচ্চবর্ণের নারীরা সতীনের জ্বালায় গৃহ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হত। অবশ্য খুল্লনাকে বনে ছাগল চরানোর অপরাধে 'অষ্টপরীক্ষা' দিয়ে সতীত্ব প্রমাণ করতে হয়েছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে নারীকে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়নি। একালে রচিত মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলে গতানুগতিক কাহিনী-ধারাকে বজায় রাখার চেষ্টা করা হলেও চরিত্রগুলির আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে নারীর এই অবস্থার আরও পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। ডোম নারীদের কথা বাদ দিলেও দেখা যায় কলিঙ্গা, কানড়া যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামীর জন্য অস্ত্রধারণ করেছে অর্থাৎ এখানে নারী শুধুমাত্র গৃহবধূ হয়ে থাকেনি, বীরাঙ্গনা হয়ে উঠেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নারীর অবস্থার আবার পরিবর্তন ঘটল। কেন্দ্রীয় শাসকের দুর্বলতার সুযোগে সর্বস্তরে অনৈতিকতা, বিলাস-ব্যাভিচার, নীতি ও রুচিহীনতা বিরাজ করেছিল, ফলে সামাজিক প্রয়োজনেই নারীকে আবার খানিকটা গৃহবন্দি হতে হয়েছিল।বস্তুত নারী এই সময়ে জীর্ণ লোকাচারের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। বৈষ্ণব ধর্মের

প্রভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে নারী অনেকখানি মুক্ত হয়েছিল, কিন্তু এই পর্বে নিরাপত্তার কারণে গৃহবন্দি হয়ে পড়লে রক্ষণশীল সমাজও তাদের প্রথার নিগড়ে আবদ্ধ করে ফেলে। ষোড়শ শতাব্দীর ভাববাদী পরিবেশে এক শ্রেণীর মানুষ আধ্যাত্ম সাধনায় উন্মার্গ হয়ে পড়লেও আরেক শ্রেণীর মানুষ পার্থিব জীবনকে আঁকড়ে ধরে আচার-বিচারে জড়িয়ে ফেলে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতেই আচার-বিচার-সংস্কার সমাজকে রুদ্ধ করে ফেলে। বিশেষত নারী সমাজ গৃহাভ্যন্তরে আচারে-সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া পুরুষশাসিত সমাজ নানা বিধান, নানা শ্রেণীতে নারীকে ভাগ করে কুক্ষিগত করে ফেলে। তাই শিবায়নে দেবী পার্বতী বাগদী নারীর বেশ ধারণ করে শিবঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হয়। অবশ্য এরপরে শিবের নিষেধ অগ্রাহ্য করে পার্বতী পুত্র-কন্যার হাত ধরে পিতৃগৃহে যাত্রা করে। ভারতচন্দ্রের কাব্যেও তাই দেখা যায় বিদ্যাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে। দাসী ও সখী পরিবেষ্টিত হয়েও বিদ্যা সামাজিক বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করে সুন্দরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যের দেবখণ্ডের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের কাব্যের দেবখণ্ডে হরগৌরীর সংসারযাত্রার ভিন্নতা দেখা যায়। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে সতী পিতৃগৃহে যেতে চাইলে শিব অনুমতি না দিলেও শেষ পর্যন্ত নন্দী-ভৃঙ্গী ও শিবানুচররা সম্মিলিতভাবে সতীকে পিতৃগৃহে পৌঁছে দেয়। ভারতচন্দ্রের সতী কিন্তু বীভৎস্য মূর্তি প্রদর্শনে শিবঠাকুরকে ভয় দেখিয়ে পিতৃগৃহে যাত্রার সম্মতি আদায় করেছে। তাই শিবঠাকুর বাধ্য হয়ে বলে ফেলে -

"মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ায়।
যে ইচ্ছা করহ বলি দিলেন বিদায়॥
রথ আনি দিতে শিব কহিলা নন্দীরে।
রথে চড়ে গেলা সতী দক্ষের মন্দিরে॥" (ভারতচন্দ্র/১৯)

ব্যাসের তপস্যা ভঙ্গ করতে অন্নপূর্ণার বিধবা ব্রাহ্মণীর ছদ্মবেশ ধারণ যতটা কাব্যের প্রয়োজনে ততটা সামাজিক প্রয়োজনে নয়। তাছাড়া মনসা বা চণ্ডী কেউই কিন্তু পুরুষের অন্যায় শক্তিকে অবদমিত করতে পারেনি। মনসা চাঁদের পূজা আদায় করতে পারেনি, চণ্ডী খুল্লনার সহায়তায় পূজা আদায় করে, অন্নপূর্ণার কিন্তু ব্যাসের মত পুরুষের স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল না। কৃষ্ণচন্দ্রের মত রাজা-মহারাজার অন্তরপুরে সে প্রতিষ্ঠিত, তাই ব্যাসের একগুঁয়েমি সহজেই ব্যর্থ করে দেয়। সমাজে নারীর অবস্থানগত পরিবর্তনের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা যায়।

পঞ্চদশ শতক থেকে নারীশিক্ষার খানিকটা হলেও অগ্রগতি হতে থাকে। মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গলে নারীর লেখাপড়া শেখার কথা পাওয়া যায় না। মনসামঙ্গলে বেহুলা ও অন্যান্য নারীদের লেখাপড়ার প্রসঙ্গ নেই। চণ্ডীমঙ্গলে খুল্লনা সামান্য লেখাপড়া জানা নারী। খুল্লনা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, অপরের হস্তাক্ষর ও ধনপতির হস্তাক্ষরের পার্থক্য সে বুঝতে পারে। বস্তুত নারী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হত না। সমাজে পুত্র সন্তান অপেক্ষা কন্যা সন্তান অবহেলিত হত। তাই পুত্র সন্তানের শিক্ষার কথা বললেও নারীকে পুতুলখেলা, ঘরকন্না, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়গুলিই মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হত। তাই ধনপতি সিংহল যাত্রাকালে গর্ভবতী খুল্লনাকে বলে যায় —

"যদি কন্যা হয় শশীকলা নাম থুয়ো।
দেখিয়া উত্তম বরে তায় বিভা দিয়ো॥
যদি পুত্রে হয় নাম রাখিও শ্রীপতি।
পড়ায়ে শুনায়ে পুত্রে করিও সুমতি॥" (মুকুন্দ / ১৫২)

বস্তুত যেহেতু অবরোধ প্রথা ও বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল তাই নারী বাল্যকালে শিক্ষালাভের সুযোগ পেত না। হিন্দু মেয়েদের মত মুসলমান মেয়েরাও অনেকে লেখাপড়া করত। গৃহশিক্ষক রেখে শিক্ষালাভ করত।[৪০] আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যে পদ্মাবতীর শিক্ষালাভের প্রসঙ্গ আছে। বিশেষত হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েদের লেখাপড়ার কথা জানা যায় – দৌলত কাজীর 'সতী ময়নামতী ও লোরচন্দ্রানী' কাব্যের নায়িকা চন্দ্রানী,

ভারতচন্দ্র ও কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যে বিদ্যা শিক্ষিতা এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে অতুলনীয়া। পুথিগত শিক্ষার বাইরে অনেক নারীই কিছু কিছু শিক্ষালাভ করত। চণ্ডীমঙ্গলের খুল্লনা, লীলাবতী, দুর্বলা দাসী, ভারতচন্দ্রের হীরা মালিনীরা কম বেশী লেখাপড়া জানত। ফুল্লরার মত ব্যাধ রমণীও পণ্ডিতের কাছে পুরাণকথা শুনেছিল, বস্তুত ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই পুথিগত শিক্ষায় না হলেও সামাজিক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম নারী চেতনার পালে অনেকটা হাওয়া লাগিয়ে ছিল বলেই নারীর চেতনাগত বিবর্তন লক্ষ করা যায়। তাইতো মুকুন্দের কাব্যে দেখা যায়, লক্ষপতি একমাত্র কন্যা খুল্লনাকে সতীনের ঘরে বিবাহ দিতে দেখে রম্ভাবতী প্রথমে স্বামীকে বোঝানোর চেষ্টা করে এবং বিফল হয়ে কন্যাকে গলায় বেঁধে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছে-

"খুল্লনা বান্ধিয়া গলে মরিব গঙ্গার জলে
নাহি দিব দারুণ সতীনে।" (মুকুন্দ / ৯৬)

রম্ভাবতীর এই আত্মপ্রত্যয় চৈতন্যদেবের ধর্ম আন্দোলনের ফল।

পঞ্চদশ শতকে বাংলাদেশে যে বৈষ্ণবধর্ম ও ভক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার সূত্র ধরেই সমাজে নারীশিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে, মধ্যযুগের বাংলাদেশ রঘুনন্দনের স্মৃতিশাসন, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, পুরুষের বহুবিবাহ, পর্দপ্রথা, জাতিভেদ প্রথা নারীকে আসূর্যম্পর্শা করে তুলেছিল। নারী ছিল ভোগের উপকরণ মাত্র, পুত্রসন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র। নারী ছিল নরকের দ্বার। নারীকে বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন থাকতে হত। ষোড়শ শতাব্দীতে এসে নারীর অচলায়তনে সামান্য মুক্তির বাতাস বয়েছিল। চৈতন্যদেবের ধর্ম আন্দোলনের পূর্বে নারী পুরুষের সঙ্গে ধর্মাচরণ করতে পারত না, কিন্তু ষোড়শ শতকে নারীরাও কীর্তনের আসরে যোগদান করতে পারত। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং নারীদের কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তিনি নারায়ণী দেবীকে শ্রদ্ধা করতেন। নারীর গুরুত্ব উপলব্ধি মধ্যযুগের পরিবেশে এক যুগান্তকারী ঘটনা। বৈষ্ণবসমাজের নারীরা নারী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। অবশ্য সেই আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি একালের মত ছিল না। সেকালে কোন কোন মহিলা ক্ষমতার শীর্ষে উপনীত হতে পেরেছিল। এই পর্বে জাহ্নবা দেবী, সীতা দেবী, হেমলতা দেবী, ঈশ্বরী ঠাকুরানী বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর জাহ্নবী দেবী খড়দহের বৈষ্ণবসমাজে প্রভূত ক্ষমতাশালী হয়েছিলেন; তিনি ছিলেন প্রথম গোস্বামীনী। জাহ্নবা দেবী ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর স্ত্রী এবং হেমলতা দেবী শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে তাঁরা শিষ্য গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মাচরণ ছাড়াও সামাজিক ভেদাভেদ দূর করতে জাহ্নবা দেবীরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।[৪১] জাহ্নবা দেবী মধ্যযুগের নারীশিক্ষা বিস্তারে অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন। মধ্যযুগের বাংলাদেশে শিক্ষাদীক্ষার তেমন চল না থাকলেও জমিদার বা স্থানীয় রাজা মহারাজাদের দৌলতে কিছু কিছু টোল, পাঠশালা, চতুষ্পাঠীতে শিক্ষাদীক্ষার আয়োজন হত, তবে তা ছিল একান্তভাবে পুরুষের জন্য। মুসলিম অধিকারের পর সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে হিন্দুসমাজে স্ত্রীরা পর্দানসীন হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল, সামাজিক বিধিনিষেধ ও প্রথার কারণেও নারীর শিক্ষাদীক্ষা সম্ভব ছিল না। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলনের ফলে জাতিভেদ ও সামাজিক বিধিনিষেধ শিথিল হয়ে পড়ে। হরিনাম সংকীর্তন ছাড়াও কাজীদলনের মত আন্দোলনে নারীরা অংশ গ্রহণ করেছিল।এই ধর্ম আন্দোলনের ফলে নারী-সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। জাহ্নবা দেবী স্বয়ং মহিলাদের বাংলা ও সংস্কৃত শেখাতেন। ধর্মগুরু ছাড়াও তিনি শিক্ষিকা ছিলেন। হেমলতা দেবীরা বিষ্ণুপুরের রাজ-অন্তঃপুরের নারীদের শিক্ষাদীক্ষার ভার নিয়েছিলেন বলে জানা যায়।[৪২] গ্রামে গ্রামে আখড়া স্থাপন করে তাঁরা ধর্মাচরণ ছাড়াও লেখাপড়া শেখাতেন। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বৈষ্ণব নারী-সমাজে এই ধরনের সচেতনতা ছিল, ফলে জাতিভেদ ও পর্দাপ্রথার মত কুসংস্কারের গ্রন্থি শিথিল হয়ে গিয়েছিল। হেমলতাদেবী বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দর্শনের উপর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, বিষ্ণুপুরের রাজমহিষীরা বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।[৪৩] ডঃ প্রভাত কুমার সাহা যথার্থই লিখেছেন— "যখন সপ্তদশ-

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কুসংস্কার এবং নৈতিকতা শিথিল হয়ে গিয়েছিল তখন বাংলাদেশে বৈষ্ণব মহিলাদের মধ্যে সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সামাজিক সংস্কারের প্রতি আকর্ষণ ও নেতৃত্ব দান নিঃসন্দেহে একটি বিস্ময়কর ঘটনা। এই পরিবর্তনকে নিঃশব্দ নারী আন্দোলনের ফল বলেই অভিহিত করা বোধহয় সমীচীন হবে।"[৪৪] মঙ্গলকাব্যগুলি অধ্যয়ন করলেও এসমস্ত ঘটনার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বৈষ্ণব সমাজ তৎকালে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত সম্প্রদায় ছিল কিন্তু তার প্রভাব সমাজের গভীরে পড়েনি একথা বলা যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী দেবী শিক্ষিতা ছিলেন, তিনি মধ্যযুগের একমাত্র মহিলা কবি বলে চিহ্নিত। শুধু পুথিগত শিক্ষাই নয় শিল্প, সঙ্গীত চর্চায়ও নারীরা অগ্রণী ছিল। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রনৈতিক অব্যবস্থায় নারীরা নিরাপত্তার কারণে গৃহবন্দি হয়ে পড়লে শিল্প, সঙ্গীত চর্চা, নৃত্যগীত পরিবেশনের স্থানগুলি দখল করে নেয় বারবনিতাগণ। তবে অভিজাত ভদ্র গৃহের নারীরা যে নৃত্যগীত ও সঙ্গীত চর্চায় পারদর্শিনী ছিল তা দেখা যায় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য থেকে। বিদ্যা ও তার সখীরা প্রত্যেকেই সঙ্গীত চর্চায় দক্ষ ছিল। এই পরিবর্তনগুলি সমাজ বিবর্তনের ফল বলে মনে করা যেতে পারে।

মঙ্গলকাব্যের নারী চরিত্রগুলি অর্থাৎ দেবী ও মানবী চরিত্রগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে পরবর্তী কাব্যগুলির একটা পারস্পর্য আছে। কালগত বিভাজন অনুযায়ী মনসামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল-ধর্মমঙ্গল এবং অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত নারী চরিত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে প্রথম সৃষ্টি মনসামঙ্গল। বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও বিপ্রদাসের কাব্যে দেখা যায় কিভাবে মনসা পরিবার ও সমাজের কাছে ক্রমাগত লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হয়ে শেষ পর্যন্ত পূজা প্রচারে অর্থাৎ আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিল। কুলীন পিতার অবৈধ সন্তান, বিমাতার দ্বারা লাঞ্ছিত, বিবাহ রাত্রে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং সমাজ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে শেষ পর্যন্ত মনসা নিজে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। মনসা ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। কিন্তু সমাজ মানস চূড়ান্তভাবে অভিব্যক্তি লাভ করে সাহিত্যে, তাই সাহিত্যের চরিত্রগুলি সমাজ চরিত্রেরই প্রতিফলন। একালের যে নারী-জাগৃতি ও নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দেখা যায় তার সূচনা হয়েছিল মধ্যযুগে, মনসা নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অন্যতম পথিকৃৎ। পুরুষশাসিত সমাজের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে পুরুষের স্বীকৃতিলাভ সেকালে সহজ ছিল না। মনসা ছলে-বলে-কৌশলে সেদিন পুরুষশাসিত সমাজের প্রতিভূ চাঁদ সদাগরের উৎকট ব্যক্তিত্ব ও একগুঁয়েমিকে পরাভূত করেছিল আপন আত্মশক্তিতে, সুতরাং মধ্যযুগের প্রথম পর্বেই নারীর আত্মজাগরণ শুরু হয়েছিল। তুর্কী আক্রমণের অভিঘাতে তৃণ- লতা-গুল্মের মত মধ্যযুগীয় সমাজের মানুষ সহজেই নারী-শক্তির প্রাধান্য মেনে নিলেও ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজের প্রতিভূ চরিত্ররা সহজে নারী-শক্তির বশ্যতা স্বীকার করেনি। সংস্কার কখনও দলবদ্ধ ভাবে সম্পন্ন হয় না, সুতরাং মনসার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে নারী-জাতিও ভাল চোখে দেখেনি, তাই চণ্ডী মনসার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেয়নি। একইভাবে বেহুলার দেবলোকে যাত্রার সংকল্পকেও সনকার মত নারীরা ভাল চোখে দেখেনি। বস্তুত বেহুলার দেবলোকে বিজয়িনী হয়ে আসা সমাজের কাছে স্বীকৃতি লাভ। মনসা জঙ্গী মনোভাব নিয়ে, বেহুলা বাঙালীর চিরাচরিত সম্পর্ক ও মমত্ববোধ নিয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। চৈতন্যদেবের ধর্ম আন্দোলন নারীর আত্মচেতনায় ইন্ধন জুগিয়েছিল। প্রেম-ধর্ম সাধনার মধ্যে দিয়ে সমাজে প্রীতির বীজ উপ্ত হয়. তাই চৈতন্যযুগে ও পরবর্তী চৈতন্য প্রভাবিত সমাজে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে মনসার খলতা, উগ্রতা যেমন হ্রাস পায় তেমনি চাঁদের উগ্র ব্যক্তিত্ববোধ হ্রাস পায়। একারণেই জগজ্জীবনের কাব্যে মনসা প্রথমেই চাঁদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের চেষ্টা করে পীরিতের পূজালাভের চেষ্টা করে এবং ব্যর্থ হয়ে বলপ্রয়োগ করে। আর এখানে চাঁদ সদাগরও অনেক বেশী নতজানু. ক্ষেমানন্দের কাব্যে চাঁদ সদাগর মনসার কাছে স্তবস্তুতি করেছে। আবার জগজ্জীবনের কাব্যে চাঁদ সদাগরকে শিবঠাকুর মনসাপূজার কথা বললে চাঁদ বলে-

"লাজ নাই পদ্মার এ মত বোলে বাণী।

শিবের ভক্তের হাতে চাহে ফুলপানি॥
স্বামীএ ছাড়িল যাকে দেখি অনাচার।
হেন জনা পূজিবার ইচ্ছা আছে কার॥ (জগজ্জীবন/১১৪)

আসলে মনসা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে গিয়ে সমাজের দৃষ্টিতে কলঙ্কিনী হয়েছিল, তাই কলঙ্কিনীর বশ্যতা স্বীকার চাঁদের পক্ষে সম্মানহানিকর ছিল। সমাজ সেদিন শক্তিমানের কাছে আশ্রয় চেয়েছিল, তাই চাঁদ সদাগর নারী-শক্তির সামর্থে বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং নারী-শক্তির উত্থানকে ভালভাবে মেনে নিতে পারেনি। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতে চণ্ডীর প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অন্য মাত্রা পেয়েছে। যে চণ্ডী একদা মনসার প্রতিষ্ঠাকে মেনে নিতে পারেনি সেই চণ্ডী স্বয়ং মনসা প্রদর্শিত পথে প্রতিষ্ঠা খুঁজেছে, কারণ মনসামঙ্গলে চণ্ডী শিথিল চরিত্র স্বামীকে নিয়ে হিম্‌সিম খেয়েছে। অকর্মণ্য, কামুক, ভোজন রসিক মানুষটি চণ্ডীমঙ্গলে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছে; সাংসারিক দায়-দায়িত্ব ও সন্তান প্রতিপালনে অপারগ দরিদ্র স্বামীর উপর আস্থা হারিয়ে চণ্ডী স্বয়ং প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করেছে। চিরাচরিত সংস্কার অনুযায়ী স্বামীকে দেবতা ভাবলেও তার কর্মক্ষমতায় আস্থা হারিয়ে স্বয়ং শক্তি অর্জন করেছে। তবে তার প্রতিষ্ঠা মনসার মত আবর্তসঙ্কুল নয়, অনেক মসৃণ। কলিঙ্গরাজকে ভয় দেখিয়ে বশ্যতা আদায় করে, কালকেতুকে ধন দান করে বশ্যতা আদায় করে এবং শেষ পর্যন্ত সমাজের মধ্যমণি ধনপতির স্বীকৃতি আদায়ে তাকে খানিকটা বেগ পেতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবীকে আর পূজা প্রচারের প্রচেষ্টা দেখা যায় না। ধর্মমঙ্গলে ধর্মদেব স্বয়ং পূজা প্রচারে আবির্ভূত হয়নি, অনুচর হনুমানকে দিয়ে কর্যোদ্ধার করেছে। ধর্মমঙ্গলে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে চণ্ডীর বিরোধ থাকলেও এই বিরোধ অনেকটা সমধর্মী। আপাতপক্ষে চণ্ডীর পরাজয় হলেও চণ্ডীই ধর্মদেবের প্রতিষ্ঠায় বাঙালী নারীর চিরায়ত ধর্মকে সামনে রেখে, কন্যা-জামাতা লাউসেন ও কানড়াকে দিয়ে ধর্মদেবকে জয়ী করেছে। আর শিবায়নে ভিখারীর ঘরণী গৌরী পরিবারের কর্ণধার হয়ে শিবঠাকুরকে কৃষিকার্যে নিযুক্ত করেছে এবং তার স্পষ্ট নির্দেশ— হয় চাষবাস করে সংসার প্রতিপালন কর, নয়তো স্ত্রী-সন্তান-দাসদাসী পরিত্যাগ কর। শুধু কৃষির দ্বারা প্রতিষ্ঠা ও স্বচ্ছলতা সম্ভব নয়— তাই শিবঠাকুরকে বাণিজ্যবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছে। রাষ্ট্রনৈতিক কারণেই চাষী শিবঠাকুর আবার ভিখারীতে পরিণত হয় অষ্টাদশ শতকে। ভারতচন্দ্রের চণ্ডীর নির্দেশ— ভিখারী পুরুষের স্ত্রী-পরিজনাদি থাকা উচিত নয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্নপূর্ণার পূজা প্রচারের কোন প্রচেষ্টা নেই, কেননা নারী তখন অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত। অষ্টাদশ শতকে নারী অনেক প্রতিষ্ঠিত বলেই পারিবারিক ও সামাজিক বিধি-বন্ধনকে অস্বীকার করতে পেরেছে। ধর্মমঙ্গলে কলিঙ্গা, কানড়া বীরাঙ্গনার মত স্বামীর সহযোগী। শুধুমাত্র গৃহবধূ হয়ে থাকা সম্ভব নয়— এই বাস্তব সত্য ধর্মমঙ্গলে উপলব্ধ। শিবায়নে চণ্ডী শিবের সঙ্গে বিবাদ করে পতিগৃহ পরিত্যাগ করেছে আর অন্নদামঙ্গলে সতী স্বামীকে ভয় দেখিয়ে পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি আদায় করেছে।

চৈতন্য-পরবর্তীকালে নারীর ভূমিকা অন্য মাত্রা পায়; নারী অনেক বেশী প্রতিবাদী বলেই জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে লখীন্দরের মৃত্যুর জন্য বেহুলাকে দায়ী করা হলে বেহুলা তা মেনে নেয়নি। বস্তুত অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলিতেও এই প্রবণতা আর দেখা যায়নি। একারণেই ধর্মমঙ্গলে কানড়া পিতামাতার নিষেধ অমান্য করে একাকী গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই করে। নিজস্ব কামনা-বাসনার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে বলেই দৌলত কাজীর কাব্যে চন্দ্রানী নপুংসক স্বামী বামনকে পরিত্যাগ করে লোরককে পতিত্বে বরণ করে। বিদ্যা সামাজিক কারণে অন্তঃপুরে বন্দি হলেও সামাজিক বিধিবিধানকে অগ্রাহ্য করে, প্রচলিত মূল্যবোধকে লঙ্ঘন করে সুন্দরকে দেহ দান করে। বস্তুত হিন্দু নারীর দ্বিতীয় পতি গ্রহণের দৃষ্টান্ত মহাভারত ছাড়া এর আগে দেখা যায়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মূল্যবোধের অবক্ষয়ে নারীও যে ভেসে গিয়েছিল তার প্রমাণ বিদ্যাসুন্দর কাব্য। সামাজিক ইতিহাসে এটাকে একটা স্থূল ধরনের বিবর্তন বলাই সমীচীন। লক্ষণীয় বিষয় যে, মনসামঙ্গলে মনসা, চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল ও শিবায়নের চণ্ডী, অন্নদামঙ্গলের অন্নপূর্ণা একই দেবীর সমাজ ইতিহাসের পরিবর্তিত রূপ। চৈতন্য- পূর্ববর্তীকালের মনসামঙ্গলে চণ্ডীর ভূমিকা অতি

সামান্য। চৈতন্য-পরবর্তীকালের মনসামঙ্গল কাব্যের মনসার সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গলে বর্ণিত চণ্ডীর বিশেষ পার্থক্য নেই। চৈতন্য প্রভাবিত সমাজে মনসা কোমল ও মসৃণ হয়ে পড়েছিল এবং মনসা-ই ধীরে ধীরে মুকুন্দের চণ্ডীতে পরিণত হয়েছে, আবার যুগের প্রয়োজনে নারী-শক্তির প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে এবং তার সঙ্গে চিরায়ত বাঙালী নারী চরিত্র মিশ্রিত হয়ে ভারতচন্দ্রের কাব্যে নিখিল জনের অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণায় পরিণত হয়েছে; শাক্ত সাধকগণের কাছে জগজ্জননীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে মধ্যযুগীয় বাঙালীর পারিবারিক জীবনের পরিচয় আছে। মনসামঙ্গল কাব্যে দেখা যায় উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিবার ছিল পুরুষ-কেন্দ্রিক অর্থাৎ পুরুষ পরিবারের কর্তা। সেখানে নারী ছায়ার মত আশ্রিত, এবং পরিবারে নারী বাল্যকাল থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত নানাভাবে পুরুষের অধীন। নারী পরিবারের কেন্দ্র স্বরূপা হলেও তার জগৎ ছিল অন্দরমহল। তাদের সুখ-দুঃখ, আবেগ-আবেদনের প্রতি পুরুষের লক্ষ ছিল না।তাই শিথিল চরিত্র পুরুষকে আঁচলে বেঁধে শুতে হয়, নারী দর্শন মাত্র পুরুষ কামাসক্ত হয় আর নারী তাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। অথচ সনকাকে গর্ভপত্র নিতে হয়েছে, বেহুলা লখীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনলেও তাকে পরীক্ষা দিয়ে সতীত্ব প্রমাণ করতে হয়েছে। সেই নারী পরিবারে কন্যা, বধূ ও মাতা রূপে স্নেহে, মায়া-মমতায় ভরিয়ে রেখেছিল। নারীর পৃথক ধর্মাচরণের অধিকার ছিল না বলেই মনসাপূজার অপরাধে সনকাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে পরিশুদ্ধি ঘটানো হয়। বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলনের ফলে নারীর স্বাতন্ত্র্য খানিকটা প্রতিষ্ঠিত হলেও তা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, তাই চৈতন্য-পরবর্তীকালের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে দেখা যায় সনকা মনসার পূজা করলে চাঁদের আগমনে তাকে ভয়ে পলায়ন করতে হয়েছে। নারীকে নানাভাবে শারীরিক নিগ্রহ ও শাস্তি বিধানের কথা পাওয়া যায় বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে। ষোড়শ শতাব্দীতে কালকেতু ফুল্লরাকে দিয়ে মুকুন্দ আদর্শ পরিবার গঠনের চেষ্টা করেছেন। আবার ধনপতি উপাখ্যানে পুরুষের বহুবিবাহের কারণে সপত্নী সমস্যা থাকলেও একটা পারিবারিক বৃত্তের ছবি আছে। ধর্মমঙ্গলেও সুন্দর পারিবারিক গঠনের চিত্র আছে। সপত্নী সমস্যা অনেকটা মর্মগত হওয়ায় বেশীরভাগক্ষেত্রেই সমস্যার সৃষ্টি হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সুন্দর সহাবস্থানের চিত্র আছে। আবার সপত্নী সম্পর্ক, বিমাতা ও সপত্নী সন্তানের সম্পর্ক অনেকটা প্রবাদের মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পারিবারিক সম্পর্কে ভাঙন ধরে, তাই পুরুষের ইতরতা ও নারী লোলুপতার চিত্র পাওয়া যায় কাব্যগুলিতে। দ্বিজ রামদেবের কাব্যে কালকেতু-ফুল্লরার মধ্যে আদর্শ পারিবারিক গঠন নেই। খাদ্য সংগ্রহ করতে না পারলে কালকেতুর ফুল্লরাকে প্রহার করার কথাও কবি উল্লেখ করেছেন। মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে পারিবারিক সম্পর্কগুলি খানিকটা শিথিল হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যে দেখা যায় নারী প্যারিব্যারিক জীবনের কর্ণধার হয়ে অনেকক্ষেত্রেই পুরুষকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাই অন্নদামঙ্গলে দাম্পত্য কলহে শিব গৃহত্যাগ করলেও শেষ পর্যন্ত তাকে অন্নপূর্ণার দ্বারস্থ হতে হয়েছে। স্বামী পরিত্যক্ত নারী শেষ পর্যন্ত পিতৃগৃহে স্থান পেত না, ফলে পতিগৃহই তর একমাত্র আশ্রয় ছিল। নিপীড়ন ও লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তাকে পতিগৃহেই থাকতে হত, মুকুন্দের কাব্যে ফুল্লরাও ছদ্মবেশিনী দেবীকে সেই উপদেশ দিয়েছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র ছদ্মবেশিনী দেবীর মুখে শুনিয়েছেন পারিবারিক দ্বন্দ্বে নারীর গৃহত্যাগের কথা, আপনজন সন্ধানের কথা। ফুল্লরা ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে গৃহে ফিরে যেতে বললেও ঈশ্বরী পাটনী কিন্তু অন্নপূর্ণাকে গৃহে প্রত্যাগমনের কথা বলেনি। চেতনা ও মূল্যবোধের পরিবর্তনেই অন্নদামঙ্গলে বাঙালীর পারিবারিক বৃত্তের এই ভাঙন লক্ষ করা যায়। সপত্নী সমস্যা, দাম্পত্য কলহ, ঘরজামাই-প্রথা, অনেকক্ষেত্রে জামাতা গৃহে কন্যার পিতামাতার বসবাসের ফলে পারিবারিক জীবনে ভাঙন শুরু হয়ে গিয়েছিল।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাঙালীর প্রেমচেতনাগত মূল্যবোধের বিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রেম একটি অনুভূতি হলেও একটি সমাজ চেতনাগত সত্ত্বা। সমাজকে অস্বীকার করে প্রেম চেতনাগত মূল্যবোধটিকে ধরা অসম্ভব। মধ্যযুগে বাংলার জনজীবন ছিল সে যুগের নানা বিধিনিষেধের অচলায়তনে আবদ্ধ। সুতরাং সে যুগের কবিগণ

সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেই সাহিত্যে প্রেমের চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাগত সারল্যের মতই তাদের প্রেমের অনুভূতিও জটিলতা মুক্ত ছিল। সাধারণ প্রেমের দু'টি রূপ ছিল, বিবাহ-পূর্ব প্রেম ও বিবাহ-পরবর্তী প্রেম। বাঙালী সমাজে বিবাহ-পূর্ব প্রেমের সমর্থন ছিল না, তাই বিবাহ-পরবর্তী গার্হস্থ্য প্রেমের চিত্রই মূলত লক্ষ করা যেত। চর্যাপদ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পর্যন্ত প্রেমের একটি রূপচিত্র পাওয়া যায়। চর্যাপদে সমাজ বিগর্হিত প্রেমের গোপন অভিসার যাত্রার চিত্র পাওয়া যায়। তারই লৌকিক জনশ্রুতি দেখা যায় জয়দেব-পদ্মাবতী কিংবা রামী-চণ্ডীদাসের প্রেমে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের রাধা প্রেম আসলে ভাগিরথী তীরবর্তী কোন গোপপল্লীর গোপ বালকের নির্লজ্জ দেহ সম্ভোগ লিপ্সার প্রকাশ। বৈষ্ণবপদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের যে প্রেম সাধনার কথা পাওয়া যায় তা সর্বদা লোকায়ত প্রেমচেতনার অভিজ্ঞতা বহন করে না, কেননা তা ছিল অনেকটা ঐশ্বরিক প্রেম। আধ্যাত্মিক প্রেমে প্রেমের সমস্যা সঙ্কুলতা দেখা যায় না - কেননা সেখানে রক্তমাংসের মানুষের পরিবর্তে মানবীয় চেতনা বিহীন একটি আধিভৌতিক শক্তিকে কল্পনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন বৈষ্ণব পদকর্তাগণ তাঁদের সৃষ্ট পদাবলীতে যে আধ্যাত্মিক প্রেমের চিত্র অঙ্কণ করেছেন তা মানব জীবন অতিরিক্ত বিষয় নয়। রবীন্দ্রনাথের তাই প্রশ্ন ছিল -

"সত্য করে কহো মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি
বিরহ তাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রুআঁখি পড়েছিল মনে ?"

তিনি বিশ্বাস করতেন বৈষ্ণব কবিগণ বাস্তব জীবন থেকেই রাধাকৃষ্ণের অলৌকিক প্রেমের চিত্র গ্রহণ করেছেন। কেননা ভারতীয় দর্শনে দেবতা আর প্রিয়জনের মধ্যে ভেদ করা হয়নি।

বৈষ্ণব সাহিত্যে পরকীয়া প্রেমের জয়গান করা হয়েছে। কিন্তু কেন ? আসলে বৈষ্ণব কবির রোমান্টিক মন সর্বদাই সমাজ জীবনের ঘেরাটোপে, গার্হস্থ্য জীবনের বন্ধনে সীমায়িত করে খণ্ডিত করে প্রেমকে দেখেননি। কিন্তু সমাজকে অস্বীকার করার মত শক্তি ও সাহস তাঁরা দেখাতে পারেন নি, তাই আধ্যাত্মিকতার মোড়কে আচ্ছাদিত করে প্রকাশ করেছেন। সমাজের কঠোর অনুশাসনে মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বা বিঘ্নিত হয়, এ কারণে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা সামাজিক অনুশাসনের মধ্যে থেকেই শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হয়েছে। বৈষ্ণবপদাবলীর নায়িকা শ্রীরাধা অবশ্য এক অর্থে বিদ্রোহিনী। চৈতন্য-পূর্ব যুগের বিদ্যাপতির রাধা রাজসভায় পদচারিনী বলেই বিলাসিনী, কিন্তু জনসভার কবি চণ্ডীদাসের রাধা ভাবসম্মিলনেই প্রেমের সমাধি দিয়েছে, গৃহপ্রাচীরকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে নি। চৈতন্যদেবের ধর্ম সাধনা যদি নারী ব্যক্তিত্বের পালে খানিকটা হাওয়া লাগিয়ে থাকে তাহলে চৈতন্যপরবর্তীকালের পদকর্তা গোবিন্দদাসের শ্রীরাধা অভিসার যাত্রায় দুঃসাহসিকা। কুল মর্যাদার কপাটকে ভেঙ্গে সে মানবীয় প্রেমের জয় ঘোষণা করেছে।মনসামঙ্গলে নরনারীর প্রেমের ছবি নেই,তবে দেবখণ্ডে শিবঠাকুর নামক চরিত্রের নারী লোলুপতার চিত্র আছে। আর বেহুলা-লখীন্দরের এক রাত্রির দাম্পত্যে কোন প্রেমের সম্পর্ক নেই। আসলে বাল্যবিবাহের ফলে নারীর প্রেমের উন্মেষ হবার আগেই বিবাহ হত, পুরুষের বিবাহও অনেক অল্প বয়সে হত, ফলে প্রেমের উন্মেষ লক্ষ করা যেত না। নারী ছিল পুরুষের সেবাদাসী, ফলে দাম্পত্য প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় না সনকা ও চাঁদ সদাগরের দাম্পত্য জীবনেও। নারী ছিল পুত্রসন্তান উৎপাদনের যন্ত্র , তাই নারীরা সাধারণত বহু সন্তানের জননী হত। চৈতন্য-পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণের ঐশ্বরীয় প্রেমের ব্যাপক প্রচারের ফলে নরনারীর সম্পর্কে প্রেমের উন্মেষ লক্ষ করা গেল। চণ্ডীমঙ্গলের বণিক খণ্ডে বিবাহিত ধনপতি পারাবত ক্রীড়ার সময় খুল্লনাকে দেখে মুগ্ধ হয়, এবং পরিণতিতে বিবাহ হয়। কিন্তু লহনা-ধনপতির দাম্পত্যে প্রেমের স্পর্শ নেই, তার কারণও হতে পারে বাল্যবিবাহ। চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি-খুল্লনার সম্পর্কে দাম্পত্য প্রেমের পরিচয় আছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে প্রেমেরক্ষেত্রে

নারীপুরুষ অনেক বেশী সক্রিয়। কানড়া তাই লাউসেনকে লাভ করার জন্য একাকী গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। বৈষ্ণবপদাবলী ও অনুবাদ সাহিত্য বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যে নারীর পতি নির্বাচন এই প্রথম। দৌলত কাজীর 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্যে চন্দ্রানীর লোরককে লাভ করার বৃত্তান্ত নারীর বলিষ্ঠতার পরিচায়ক। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল হারেম থেকে আগত ব্যাভিচার ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা দেশীয় জমিদার ও রাজা মহারাজাদের রাজসভা হয়ে জনসভায় প্রবেশ করে যায়। একারণেই বৈষ্ণবপদাবলী ও পরকীয়া তত্ত্বের বিকৃত ব্যাখ্যা করা হতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যে প্রেমের স্পর্শ নেই। জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে লখীন্দরের মাতুলানীর ইজ্জত হরণ বৃত্তান্ত, অন্নদামঙ্গলে রতিবিলাপে, শিববিবাহ ও হরগৌরীর দাম্পত্য সম্পর্কে, নলকুবর বৃত্তান্তে, বসুন্ধর-বসুন্ধরা বৃত্তান্তে, বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয়ে, মানসিংহ পালায় দাসু-বাসুর উক্তিতে কামনার ক্লেদ ছাড়া প্রেমের স্পর্শ পাওয়া যায় না। এমন কি দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রেমের স্পর্শ নেই, ভারতচন্দ্রের নারীদের পতিনিন্দা কিংবা ধর্মমঙ্গলে সুরিক্ষা ও নয়ানীর বৃত্তান্তে, গোপীচন্দ্রের গানে হীরানটীর আখ্যানে প্রেমের ছোঁয়া পাওয়া যায় না। তাছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত কবিগান, খেউর, ঝুমুর গানে অশ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করেছিল। অর্থনৈতিক প্রয়োজন এখানে নারীকেও বিপথগামী করে তুলেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থায় পুরুষের ভ্রমর বৃত্তি নিন্দনীয় ছিল বলে মনে হয় না।বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রেম কখনোই সংসারের সীমারেখাকে, পার্থিব জীবনকে অতিক্রম করে যেতে পারে নি। আসলে গার্হস্থ্য জীবনে বাঙালীর প্রেমের আদর্শ ছিল সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ। তাই বিবাহিত জীবনই মঙ্গলকাব্যের নায়ক-নায়িকাদের আদর্শ ভূমি। একারণেই লখীন্দরের মৃত্যুর পর দেবলোক বিজয়িনী হয়ে ফিরে আসাতেই বাঙালীর মন প্রেমাপ্লুত হত। সেখানেই তার নিষ্ঠা ও বীর্যের প্রকাশ। চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরা, লহনা ও খুল্লনার প্রেমের গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে সহনশীলতা ও নীরব স্বামী সেবার মধ্যে দিয়ে। দেবখণ্ডে হর-গৌরীর সংসারযাত্রার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। পার্থিব জীবনে ছোটখাটো সুখ-দুঃখের মধ্যে যে জীবন রস আছে তাতেই প্রেমের সার্থকতা। তাইতো ব্রতকথায় ব্রতীর সমস্ত কামনা স্বামী ও পুত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে, আরাকান রাজসভায় সৃষ্ট কাব্যগুলিতে প্রেমের বলিষ্ঠতা প্রকাশিত। বিদ্যাসুন্দরের বিবাহপূর্ব ভোগ চিত্রে সমাজের ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের গণ্ডী অতিক্রম করে দেহজ আকর্ষণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সমাজ মানসিকতার পরিবর্তনই এই পরিবর্তন চিহ্নিত করে।

নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতাহীনতা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অসহযোগিতা প্রেমের উন্মেষে সহায়তা করেনি। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে যতটুকু নারী চেতনা জাগ্রত হয়েছিল তারই অনুরণন শোনা গিয়েছিল এই পর্বের সাহিত্যে। একই কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে বিধবা নায়িকাদের ও সমাজ বিগর্হিত প্রেমের একাধিপত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য প্রেম চেতনায় যুগগত বিবর্তন চিহ্নিত করেছে।

মনসামঙ্গল থেকে অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত প্রতিটি কাব্যেই একটি বিশিষ্ট চরিত্র শিব। অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিতে শিবের ভূমিকা আছে। মনসামঙ্গল কাব্য থেকে শিব চরিত্রটির পরিণতি লক্ষ করলে বোঝা যায় যুগগত পরিবর্তনের ফলেই শিব চরিত্রটি বিবর্তিত হয়েছে। মনসামঙ্গলে শিবঠাকুর ইন্দ্রিয়পরায়ণ গ্রামীণ সমাজপতি, চণ্ডীমঙ্গলে শিবঠাকুর ভিখারী, শিবায়নে শিবঠাকুর কৃষক, আর অন্নদামঙ্গলে শিবঠাকুর আবার ভিখারীতে পরিণত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মানিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলেও শিব ঠাকুরের ভিক্ষাবৃত্তির প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে।পঞ্চদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গলের প্রধান রচয়িতারা হলেন বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব এবং বিপ্রদাস পিপিলাই। তিনজন কবির কাব্যেই শিব চরিত্রটি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্রাহ্মণ সমাজপতি। কৃষিজীবী সমাজের দেবতা হলেও সে অলসতাবশত কৃষিকাজ করে না। তবে কখনো কখনো তাকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে দেখা যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণের ফলে

হিন্দুসমাজ থেকে ব্রাহ্মণের ক্ষমতাচ্যুতি ঘটেছিল ; একারণে বাঙালী সমাজের উপর থেকে তাদের এতদিনের কর্তৃত্বের অবসান ঘটেছিল। প্রাক্ তুর্কী আক্রমণকালে বাংলার গ্রামগুলি ছিল নিস্তরঙ্গ। ফলে গ্রামবাসীরা ছিল ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও ভাববিলাসী। রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের ক্ষমতাচ্যুতি ঘটলে সেই স্থান দখল করে নেয় অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ নবোদ্ভূত বণিক সমাজ। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরও অলসতাবশত দেববৃত্তি কৃষিকাজে অমনোযোগের ফলে ব্রাহ্মণদের ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক অবস্থার অবনমনের ফলে ব্রাহ্মণ ও চাষার ভেদ বোধহয় খানিকটা কমে গিয়েছিল, তাই বচাই চাষার গৃহে সকন্যা শিবকে দেখে বচাই জননী বিনতা ভাবে, শিব বোধহয় তার পুত্রের সঙ্গে কন্যা বিষহরির বিবাহ দিতে এসেছে। নরায়ণ দেব লিখেছেন -

"হাল চষিতে চাষাগণ দেখিল সুন্দরি।
বুলেলেক চাষাগণ দেখিয়া বিষহরি॥
নাচে বচাইর মাও বিনতা সুন্দরি।
কন্যা বিহা দিতে আইল সিব অধিকারী॥ (নারায়ণ দেব / ২৪)

আর্থসামাজিক পরিবর্তনের ফলে এইভাবে ব্রাহ্মণের অধঃপতন ঘটেছিল। বিপ্রদাসের কাব্যে ডোমনী বেশধারী চণ্ডী শিবকে 'দেবতা' বলে সম্বোধন করেছে। তৎকালে ব্রাহ্মণ দেবতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে শিব ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্রাহ্মণ সমাজপতি হলেও তার সংসারে অভাব অনটন ছিল না। তবে প্রায় প্রতিটি মনসামঙ্গলেই শিবঠাকুরের কোচ রমণীর সংসর্গ দোষের কথা আছে। বস্তুতঃ মধ্যযুগে ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের ইন্দ্রিয়লিপ্সা ও ভণ্ডামী সমাজকে কলুষিত করেছিল। তাই কবি স্বয়ং ভণ্ড সমাজপতিদের হাত থেকে সমাজকে রক্ষার জন্য চণ্ডীর কাছে আবেদন জানিয়ে লিখেছেন -

"ডোমনির সঙ্গে সহিয়ালা করে সাধিবারে কাজ।
সেই চণ্ডী রক্ষা কর সুজন সমাজ॥ (বিজয় গুপ্ত / ২৭)

গ্রামীণ সমাজ অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকায় শিবঠাকুরকে সংসার প্রতিপালনে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। মনসামঙ্গলে একমাত্র নারায়ণ দেবের কাব্যে শিবঠাকুরের ভিক্ষাবৃত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। ডোমনী বেশধারী চণ্ডী শিবঠাকুরকে নৌকায় পার করতে গিয়ে বলেছে —

"ঘরের স্ত্রী তুমি রাখিতে না পার।
দেবের দেবরাজ নাম কেনে ধর॥
জর্ম্ম ভিকারি বাউল বচন মাত্র সার।
কড়া গোটা নাহি তোমার পার হইবার॥" (নারায়ণ দেব / ৬)

মনসামঙ্গল কাব্য গ্রামজীবনের কাব্য হওয়ায় তার ছায়াপাত ঘটেছে শিব চরিত্রেও। নারায়ণ দেবের কাব্য রচিত হয়েছিল পঞ্চদশ শতকের শেষ থেকে ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে। ষোড়শ শতাব্দীতে সমাজে ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি থাকলেও অর্থকৌলীন্য অনেক বেশী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময় অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে সংসার প্রতিপালনে অক্ষম শিবঠাকুর ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিবের ভিক্ষোপজীবীতার কথাই বলেছেন। এ সময়ে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলনের ফলে ব্রাহ্মণ তাদের হৃত সামাজিক মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি। কারণ চৈতন্যদেবের সাম্যের গান মানুষকে সামাজিক মর্যাদায় অনেকখানি কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। তবে ব্রাহ্মণ ভিখারী হলেও যে সমাজে তাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় মুকুন্দের কাব্যে দেবরাজ ইন্দ্রের ভিখারী শিবের পূজার মধ্যে দিয়ে। 'ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর' অন্যান্য জাতির ব্যবধান হ্রাস পেলে ব্রাহ্মণের স্থান সংরক্ষণের জন্য স্মার্তপণ্ডিতগণ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ব্রাহ্মণেতর

সমস্ত জাতিকে 'শূদ্র' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু করণ বা কায়স্থ, অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য এবং নবশায়ক নামে জাতি ব্যবস্থার নতুন স্তর বিন্যাস হল, একারণে ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য জাতি সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অর্থকৌলীন্যের জোরে বণিক, কায়স্থ ও বৈদ্যরা সমাজের মধ্যমণি হয়ে পড়লে ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া গত্যন্তর থাকল না। বস্তুতঃ সেকালে ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন নিন্দনীয় ছিল না। বৈষ্ণবসমাজে ভিক্ষাবৃত্তি দেববৃত্তি হিসাবে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমাজের দীন-দরিদ্ররা বৈষ্ণবধর্মের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করলে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণের সামাজিক বাধাও দূরীভূত হয়। এইকারণে ষোড়শ শতাব্দীর প্রধান কাব্য চণ্ডীমঙ্গলের শিবঠাকুর ভিখারী। মুকুন্দ চক্রবর্তী ব্রাহ্মণের কৃষিকাজের কথা বললেও বাস্তবে ব্রাহ্মণের কৃষিকাজ খুব একটা সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না বলেই বোধ হয় ; তাই হিমালয় প্রদত্ত ভূমিতে মসূর, কার্পাস, মাষ, ধান ফললেও ঘরজামাই শিবঠাকুর কৃষিকাজ করে না, বরঞ্চ ভূত-প্রেত নিয়েই তাস-পাশা খেলে আলস্যে দিনযাপন করে। কিন্তু আপন সংসারে এসে পাকাপাকিভাবে ভিক্ষুকে পরিণত হয়। সে চাল-ডাল-নুন-তেল-কড়ি-নাড়ু সকলই ভিক্ষা দ্বারা সংগ্রহ করে থাকে। মনসামঙ্গলে শিবঠাকুরের ভিক্ষোপজীবীতার কথা থাকলেও সে পেশাদারী ভিক্ষুক নয়; সে কখনো কখনো ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে যেহেতু চৈতন্য প্রভাবিত মুক্ত সমাজ বিরাজিত ছিল, তাই শিবঠাকুর কোচগৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করলেও কোচনী বা ডোমনী সংসর্গ দোষের কথা নেই। জনসমাজের আর্থসামাজিক অবস্থা অনেকখানি স্বচ্ছল ছিল বলেই ভিক্ষা দ্বারা, চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের আয়োজন হত। চণ্ডীমঙ্গলের শিবঠাকুর ভিক্ষোপজীবী হলেও ভোজনরসিক বাঙালীর প্রতিনিধি। স্ত্রী গৌরীকে মনোমত রন্ধনের দীর্ঘ ফিরিস্তি দেয়, কিন্তু ভিক্ষাতেও তার আলস্য, তাই প্রত্যহ ভিক্ষায় যায় না। গৌরী তাকে হাতের ত্রিশূল বন্ধক দিয়ে চাল সংগ্রহ করতে বললে ক্ষুব্ধ শিবের সংসার-নিরাসক্তি জন্মায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার আর্থসামাজিক অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। এই শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালেই আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এবং জনমানস অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছিল। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মঙ্গলকাব্যের ভাবধারাগত পরিবর্তন হয়েছে। শিবঠাকুর চরিত্রটিরও এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নবরূপায়ণ ঘটেছে। বস্তুতঃ রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন বা শিবসঙ্কীর্তন পালা কাব্যের শিবঠাকুর কৃষক; সে কৃষিজীবী সমাজের দেবতা। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের ভিখারী শিবঠাকুর রামেশ্বরের কাব্যে কৃষকে পরিণত হয়েছে। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর প্রধান মঙ্গলকাব্য-ধারা ধর্মমঙ্গলে শিবঠাকুরের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি নেই। এর কারণ অষ্টাদশ শতাব্দী শৈবধর্মের ভগ্নতার যুগ। এই শতাব্দীর শেষ পর্বে রামকৃষ্ণ রায়ের শিবায়ন কাব্যে এবং রামরাজা ও রতিদেবের মৃগলুব্ধ কাব্যে শৈবধর্মের পুনরুত্থানের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়, কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। রামকৃষ্ণ রায় মহেশ্বর জ্বর ও বিষ্ণু জ্বরের যুদ্ধে হরি-হরের অভেদত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নে মহেশ্বর জ্বর ও বিষ্ণু জ্বরের যুদ্ধে মহেশ্বর জ্বরের পরাজয় শৈবধর্মের বিভগ্নতা সূচিত করে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য শিবঠাকুরের কৃষিকাজের কথা বলেছেন ; যদিও শিবঠাকুরের কৃষিকাজের বিবরণ বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়। রামাই পণ্ডিত বিরচিত শূন্যপুরাণে, বিভিন্ন লৌকিক ছড়ায় শিবঠাকুরের কৃষিকাজের বিবরণ পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণ রায় পৌরাণিক শিব মাহাত্ম্য কীর্তন করলেও বাংলাদেশের ভিক্ষোপজীবী শিবের স্বরূপ তিনি স্পর্শ করে গেছেন। আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে বণিক শ্রেণী সমাজের মধ্যমণি হয়ে পড়লে মানুষের ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তারও পরিবর্তন ঘটতে থাকে, ফলে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ হলেও তার সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হয়। ফলে শুধুমাত্র ভিক্ষোপজীবীতার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। তাই রামকৃষ্ণ রায়ের কাব্যে গৌরীর মুখে আক্ষেপ শোনা গিয়েছিল। আরো পরবর্তীকালে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে গৌরী শিবঠাকুরকে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য চাষবাস করতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিনিধি শিবঠাকুরের কৃষিবৃত্তি গ্রহণে

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। ব্রাহ্মণের 'পোতবৃত্তি' লঘুকর্ম বলে মনে হয়েছিল, "নরোত্তম ছাড়্যা নরাধম উপাসনা" (রামেশ্বর / ২১৭) বলে মনে হয়েছিল। শিবঠাকুর বাঙালী কৃষক সমাজের দৈন্যদশার কারণ জানত, তাই সে কৃষিবৃত্তি গ্রহণে দ্বিধান্বিত ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত আত্মনির্ভরতার কারণে সে ইন্দ্রের কাছে দেবোত্তর পাট্টা হিসাবে জমি নিল, কুবেরের কাছ থেকে বীজ ধান ঋণ নিল, হাতের ত্রিশূল ভেঙ্গে বিশ্বকর্মার কাছ থেকে লাঙল, জোয়াল তৈরী করিয়ে নিল এবং শেষে নিজের বলদ আর গৌরীর বাঘের সাহায্যে হাল তৈরী করে ভীম নামক মাহিন্দারকে সঙ্গে নিয়ে জমি চাষের জন্য মর্ত্যে যাত্রা করল। বাংলার ভূমিতে সোনার ফসল ফললে শিব ফসলের মোহে ঘর-সংসার ভুলে গেল। এইভাবে ভিখারী শিবের সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য এল, শিব কৃষকে পরিণত হল। কৃষক পত্নী গৌরী এবার হাতের শাঁখার আবদার করল। এইভাবে আর্থসামাজিক পরিবর্তন শিব চরিত্রটিকে পরিবর্তিত করেছিল।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে বণিক শ্রেণীর প্রাধান্য থাকলেও সাধারণ জনসমাজে বাণিজ্য বৃত্তি খুব একটা গ্রহণীয় ছিল না। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রধান চরিত্রগুলি হল অর্থকৌলীন্য পুষ্ট নবোদ্ভূত বণিক সমাজ। মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম ধারা মনসামঙ্গলে পাল ও সেন যুগের বাঙালী বণিককুলের বহির্বাণিজ্যে একচ্ছত্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা তারই ইঙ্গিতবাহী। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে বিদেশী বণিকদের আগমন ঘটতে থাকলে এবং পর্তুগীজ জলদস্যু হার্মাদের আক্রমণের ফলে বাঙালী বণিকদের বহির্বাণিজ্যে একচ্ছত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। একারণে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাণিজ্যের পরিবর্তে রাজকীয় উদ্যোগে বাণিজ্য শুরু হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি ও শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রায় রাজকীয় উদ্যোগে বাণিজ্যযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষপর্ব থেকে বিদেশী বণিকদল ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে আগত বণিকদল দেশীয় হাট ও নগর বাজারের ব্যবসায় ভাগ বসাতে থাকে। রামপ্রসাদ সেন ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বর্ণিত বর্ধমান নগরে দেশী-ভিন্‌দেশী বণিকদের সমাগম লক্ষ করা যায়। এ কারণেই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রধান কাব্য ধর্মমঙ্গল ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে বণিক শ্রেণীর প্রাধান্য নেই। শিবায়ন কাব্যে দেখতে পাওয়া যায় শিবঠাকুর বাণিজ্যের কথা বললেও গৌরী শিবঠাকুরকে বাণিজ্যে উৎসাহিত করে নি। দেবাদিদেব কৃষিকাজ ছাড়া অন্য কোন বৃত্তি সম্পর্কে গৌরীর পরামর্শ চায় -

"চাষ অভিলাষ ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী।
আর কিছু ব্যবসায় বল তাহা করি॥" (রামেশ্বর / ২১৭)

বস্তুতঃ 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস' অর্থাৎ বাণিজ্য দ্বারা অর্থাগমের খবর জনসমাজে প্রবাদের মত ছড়িয়ে ছিল। কিন্তু সাধারণ বাঙালী প্রবঞ্চকের বৃত্তি গ্রহণে প্রস্তুত ছিল না; তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনও বাঙালীর ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেখা গেল বৃত্তি হিসাবে ব্যবসা-বাণিজ্য সমাজে অনেকখানি জায়গা করে নিয়েছে। এই কালপর্বে ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। তাই দেখা যায় ভারতচন্দ্রের গৌরী শিবঠাকুরকে বাণিজ্যের পরামর্শ দিয়েছে। ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি সমাজে নিন্দনীয় হয়ে পড়েছিল। চিরাচরিত পদ্ধতিতে কৃষিকাজ এবং জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা শোষিত হয়ে কৃষকের অবস্থাও হীন হয়ে পড়েছিল। তাই স্বাধীনভাবে বাণিজ্যবৃত্তির প্রতি মানুষের আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। বস্তুতঃপক্ষে কৃষির দ্বারা মানুষের দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব না হলেও অর্থের বিনিময়ে ক্রীত দ্রব্যের চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। তাই শিবায়নে শিবঠাকুর স্ত্রীর সামান্য শাঁখা পরার শখ পূরণে অক্ষম ছিল। সেকালে সাধারণ বাঙালী গ্রামীণ কুটীরশিল্পজাত দ্রব্য স্থানীয় হাট বা বাজারে বিক্রয় করে অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাত। কখনো গাঁওয়ালে বিক্রয় করত। শিবায়নে শিবঠাকুর স্বয়ং শঙ্খ কেটে শাঁখা তৈরী করে বিক্রয় করেছে।

চাকুরি বৃত্তি তখন পর্যন্ত সাধারণ বাঙালীর বৃত্তিগত মানসিকতায় আসেনি। সাধারণত উচ্চবিত্তের শিক্ষিত

সম্প্রদায় রাজসভায় উচ্চপদ অলঙ্কৃত করত। কতিপয় সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ নিম্ন জাতির মানুষ এবং মুসলমানরা সেনাবাহিনীতে যোগদান করত। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত ধর্মমঙ্গলে রাঢ়বাসী অন্ত্যজ ডোম সম্প্রদায়ের স্বীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করে দলে দলে সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে দেখা যাচ্ছে। আর্থসামাজিক প্রয়োজনেই মানুষ বৃত্তি পরিবর্তন করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু উচ্চবর্ণের মানুষ চাকুরি বৃত্তি অর্থাৎ অন্যের সেবা বৃত্তি গ্রহণে প্রস্তুত ছিল না, কেননা বর্ণব্যবস্থার উপরের স্তরে অবস্থিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এতদিন অন্যের সেবা পেয়ে অভ্যস্ত ছিল। আর্থসামাজিক কারণে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হলেও মনে লুপ্ত সম্মানের অহঙ্কার প্রচ্ছন্ন ছিল। তাই দেখা যাচ্ছে শিবায়নে গৌরী শিবঠাকুরকে পরামর্শ দিতে গিয়ে চাকুরি বৃত্তির কথা মনে হলেও তার সংশয় প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতচন্দ্রে এসে দেখা যাচ্ছে রাজসেবা গৌরীর কাছে 'খচমচ' মনে হয়েছে, তাসত্ত্বেও চাকুরি বৃত্তি বাঙালী মানসিকতায় অনেকখানি জায়গা করে নিয়েছে। ভারতচন্দের কাব্যে তাই চাকুরি বৃত্তিধারী বিভিন্ন শ্রেণীর কথা আছে। ভারতচন্দ্র স্বয়ং ভাতাগণের নিকট তিরস্কৃত হয়ে চাকুরি বৃত্তি গ্রহণের জন্য রাজভাষা ফারসী শিক্ষা করেছিলেন। বাঙালী নারীর ব্রতের কামনায় তাই স্বামীর ফারসী শিক্ষালাভের প্রসঙ্গ এসেছে। বাঙালী নারীর কামনা বাস্তব প্রয়োজন ও পার্থিব সীমাকে অতিক্রম করে বেশী দূর যেতে পারে নি।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের শিবঠাকুর পেশাদারী ভিক্ষুক, সে জীবনযাপনের সমস্ত উপকরণই ভিক্ষা দ্বারা সংগ্রহ করে। হরগৌরীর সংসারযাত্রা বর্ণনায় ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু দুই কবির যুগগত প্রেক্ষাপট ও আদর্শ ভিন্নতর ছিল। ভারতচন্দ্রের ভিখারী শিবের পরিকল্পনার পিছনে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটই বড় ছিল বলে মনে হয়।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বিভিন্ন কারণে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। এই পর্বে বাংলার জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কারণগুলি হল - ক) শাসকের শোষণ ; খ) রাজকর্মচারীদের নিপীড়ন-নির্যাতন ; গ) বিদেশী বণিক, দালাল, মহাজনদের প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা ; ঘ) নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এই সমস্ত কারণে এ সময় এক শ্রেণীর মানুষ প্রচুর অর্থ উপার্জন করে ধনী হয়ে উঠেছিল, আর এক শ্রেণীর মানুষ ক্রমাগত দারিদ্র্যের গভীরে নিমজ্জিত হয়েছিল। ছোট বড় রাজা, জমিদার ও শাসকের শোষণের ফলে সাধারণ মানুষ কর্পর্দকশূন্য হয়ে পড়েছিল আর তাদের বিন্দু বিন্দু চোখের জল রৌপ্যচক্রে পরিণত হয়ে ধনীর বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে এই বৈষম্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অদৃষ্টবাদী বাঙালী এই পরিস্থিতিকে দৈবের পরিহাস বলে মেনে নিলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্বে রচিত সাহিত্যে কৃষক সমাজের সঙ্কট ও বিক্ষোভের পরিচয় পাওয়া যায়। শাক্ত পদকর্তাগণ এই অরাজকময় পরিস্থিতিতে জগজ্জননী শ্যামামায়ের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। শাক্ত পদকর্তা রামপ্রসাদ সেন শ্যামামায়ের কাছে এই সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে নালিশ করেছিলেন

"কে বলে তোমাকে তারা দীন দয়াময়ী।
কারে দিলে ধনজন মা, হয় হাতী রথী জয়ী,
আর কারো ভাগ্যে মজুর খাটা শাকে অন্ন মেলে কই।
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
কেহ থাকে অট্টালিকায় আমার ইচ্ছা তেমনি রই।
কারো অঙ্গে শাল দোশালা, ভাতে চিনি দই।
আবার, কারো ভাগে শাকে বালি ধানে ভরা খই।
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
মাগো, আমি কি তোর পাকা ধানে দিয়েছি মই॥"

কিংবা —

"কেহ সারাদিন পায়না খেতে, কেহ সুখে খায় সাদা চিনি।
কেহ শুয়ে তেতলাতে পালঙ্কে মশারি টানি॥
আমরা মরি শুড়শুড়িয়ে, ভাঙা ঘরে নাইকো ছানি।
অনুভবে বুঝি তারা তেলা মাথায় তেল ঢালানি॥"[৪৫]

ধর্মকেন্দ্রিক বাঙালী কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য এই পদটিতে ফুটে উঠেছে। বস্তুতঃ এক শ্রেণীর মানুষ রাজা বা জমিদারের বিভিন্ন দফ্তরে কিংবা নবাগত ইংরেজ বণিকের বিভিন্ন অফিসে চাকুরি গ্রহণ করায় অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল হয়ে পড়েছিল। ডঃ সুকুমার সেন গোটা মধ্যযুগের সামগ্রিক বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে লিখেছেন - "হোসেনশাহী বংশের অবনতির সময় হইতে দেশের বাণিজ্যিক অবস্থা তাড়াতাড়ি পড়িয়া আসিতেছিল। তাহার পূর্ব হইতে বহির্বাণিজ্য বাঙ্গালীর হস্তচ্যুত হইয়াছিল। এখন ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিদেশী বণিকের অনুপ্রবেশ দ্রুত ঘটিতে লাগিল। তাহার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সাধারণ বাঙ্গালী বিশেষ করিয়া ভূমি উপজীবী হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণের মর্যাদা আরও বাড়িতে থাকে বটে কিন্তু রাঢ়ীয় কুলীনগিরির দরুন বহুবিবাহের ফলে কুলীন ব্রাহ্মণের সংখ্যা আরও দ্রুত বাড়িতে লাগিল। যজন-যাজন, অধ্যাপন ও গুরুগিরি ছাড়া তাঁহাদের আর কোন বৃত্তির সুযোগ না থাকায় ব্রাহ্মণদের আর্থিক অবস্থা দিন দিন হীন হইয়া পড়িতেছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতি, যাঁহারা চাকরি ও কায়িক শ্রম হীনকর্ম মনে করিতেন না আর যাঁহারা জমি চষিতেন, তাঁহাদের অবস্থা তেমন খারাপ হয় নাই"।[৪৬]

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যপর্বে বাংলাদেশে মারাঠা বর্গীর আক্রমণ ঘটেছিল। বর্গী আক্রমণের ফলে বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। বাংলার গ্রাম কে গ্রাম শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। সবকিছু মিলিয়ে বাংলার গ্রামগুলির স্বয়ম্ভর অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যে সমস্ত মানুষ কৃষিকাজের দ্বারা স্বচ্ছলতার মুখ দেখেছিল, তারা সর্বস্ব হারিয়ে ভিক্ষুকে পরিণত হয়। শিবায়নে যে শিবঠাকুর কৃষির দ্বারা স্বচ্ছলতা আনতে চেয়েছিল ভারতচন্দ্রে সে আবার পেশাদারি ভিক্ষুকে পরিণত হল। এসময়ে স্বচ্ছল ধনীরাও সর্বস্ব হারিয়ে কর্পর্দকশূন্য হয়ে পড়েছিল। তাইতো ধন-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর ঘরেও অন্নাভাব দেখা দেয়। শিবঠাকুর যেদিকে ভিক্ষাযাত্রা করে সেদিকেই 'হা অন্ন হা অন্ন' ক্রন্দন ধ্বনি শুনতে পায়। মানুষ জীবনযাপনের জন্য ন্যূনতম জীবিকাকেও গ্রহণ করেছিল। হরিহোড়ের জনক-জননীর দারিদ্র্য একথাই প্রমাণ করে। তাই মানুষের কাছে অন্নের চাইতে শ্রেয় কাম্য বস্তু আর কিছুই ছিল না - ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনার ভিতরে এই সত্যই নিহিত আছে। এইভাবে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রস্তুতিভূমি রচনা করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে অর্থনৈতিক অবস্থা আরো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। দ্রুত পরিবর্তমান সমাজব্যবস্থার সঙ্গে বর্ণব্যবস্থা তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হয়। জাতি ব্যবস্থার পরিবর্তন ও শিক্ষা বিস্তারের ফলে নতুন সমস্যা দেখা দেয়। যে বর্ণব্যবস্থায় গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল, মানুষ তাকে অস্বীকার করে, বংশগত বৃত্তি পরিত্যাগ করে, ফলে সমাজে বেকার সমস্যা দেখা দেয়।

সাহিত্য যদি সমাজের দর্পণ হয় তাহলে সামাজিক পরিস্থিতিই সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করবে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত আর্থসামাজিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় মঙ্গলকাব্যগুলিতে। প্রায় তিন'শ বছর বিস্তৃত কালপর্বে জন চরিত্রের বিশিষ্ট প্রতিনিধি শিবঠাকুর বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে এভাবে ক্রমবিবর্তিত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ শিব চরিত্র পরিকল্পনার পিছনে যথার্থ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

অনেক সমালোচক পণ্ডিতের মতে ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি অষ্টাদশ শতকে অন্নদামঙ্গলে পরিণত হয়েছে। ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশেই চণ্ডীমঙ্গলের আদর্শে অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন।[৪৭] কিন্তু লক্ষণীয়, মুকুন্দ চক্রবর্তীর দু'শ বছর পরে যে কাব্যাদর্শ গড়ে উঠেছিল তার যুগগত প্রবণতা, সংস্কার,

রুচিবোধ সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সমাজ ইতিহাসে যে বিবর্তন ঘটেছিল সেই বিবর্তনকে সাক্ষী করেই অন্নদামঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাহিনীধারা এক হলেও যুগচেতনা ভিন্নতর হওয়ায় কাব্যদেহে যুগচেতনা অনুযায়ী রূপ লাভ করেছে। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীকে একান্তভাবে দৈববাদী যুগ বলা যায়। দৈবশক্তি অপরিমেয় ও অপ্রতিহত, মানব-শক্তি সেখানে নিতান্তই দীনহীন। দৈবশক্তির কাছে মানব-শক্তি ক্রমাগত লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত বলেই ভয়ে-ভক্তিতে মানুষ দৈবশক্তির উপর একান্তভাবে আস্থাশীল ছিল। দৈবশক্তির ক্রীড়নক হয়েই মানুষ তাদের সারস্বত জীবন সমাপ্ত করেছে। দৈব শক্তিই হোক আর শাসকের শোষণ - মানুষ তা নির্বিবাদে গ্রহণ করে এসেছে। মনসামঙ্গলের সাধারণ মানুষ কিংবা চণ্ডীমঙ্গলের আখেটিক খণ্ডের পশুসমাজ প্রত্যেকেই দৈব প্রত্যাশী। এই যুগের একমাত্র প্রতিবাদী বিদ্রোহী নায়ক চাঁদ সদাগর। তাই তো একালের কবি চাঁদ সদাগরের বন্দনা করে তাকে তৃণলতা-গুল্ম দলের মধ্যে বজ্রজয়ী বনস্পতির মর্যাদা দিয়েছেন। চাঁদ সদাগরের এই উগ্র ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ কতটা পঞ্চদশ শতাব্দীর যুগ চরিত্রের বিষয় তা প্রশ্নাতীত নয়, কেননা চাঁদ সদাগরের পৌরুষ সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পুরুষ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল না। কিন্তু লক্ষ করা যাচ্ছে পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে ধারাবাহিকভাবে চাঁদ সদাগর চরিত্রের এই পৌরুষ রক্ষিত হয় নি। বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও বিপ্রদাসের চাঁদ সদাগর চরিত্রটি পরবর্তীকালে ক্ষেমানন্দ, জগজ্জীবন ঘোষাল, তন্ত্রবিভূতিতে এসে যুগ প্রভাবে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলন বাঙালী সমাজে প্রীতি রসের বন্যা নিয়ে এসেছিল এবং তারই প্রভাবে মানব চরিত্র হয়েছিল কোমল ও কমনীয়। একারণেই কাশীরাম দাসের মহাভারতের অর্জুন আর্য বীর নয়, করুণ কমনীয় বাঙালী পুরুষ। প্রথম পর্বে রচিত মনসামঙ্গলের বিদ্রোহী নায়ক আর্য বলদীপ্ত মহাকাব্যের নায়ক, আর চৈতন্যপরবর্তী যুগের চাঁদ সদাগর বাঙালী পুরুষ। বিজয় গুপ্ত কিংবা নারায়ণ দেবের চাঁদ সদাগর শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সহকারে দেবীর কর্তৃত্ব স্বীকার করলেও চৈতন্য পরবর্তী যুগের চাঁদ সদাগর দেবীর কাছে অনেক বেশী নতজানু। চৈতন্য-পূর্ব যুগের কাব্যের চাঁদ সদাগর কঠোর শিবভক্ত, সে দেবশূলপাণি ছাড়া অন্য কোন দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু চৈতন্যপরবর্তীকালে এসে জগজ্জীবনের চাঁদ সদাগর শিবের সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। ধর্ম সমন্বয়ের ভাবনা থেকে চাঁদ সদাগর অনেক বেশী আপোষপন্থী। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন - "মনসা অত্যাচারী রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক এবং চাঁদ সদাগর অত্যাচারিত হিন্দু সমাজের প্রতীক"।[৪৮] এই মন্তব্য স্বীকার করে নিয়ে বলা যায়, তুর্কী আক্রমণের প্রথম যুগে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক যে রকম ছিল, পরবর্তীকালে মোগল যুগে তা অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছিল। দীর্ঘদিনের সহাবস্থান শাসক ও শাসিত অর্থাৎ মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে সৌহার্দ্য সৃষ্টি করেছিল। এ কারণেই জগজ্জীবনের মনসা চাঁদের কাছে পিরীতের পূজা কামনা করেছিল। তাই চাঁদ সদাগরও অনেক বেশী নমনীয়।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রধান কাব্য চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতির দেব বিরোধিতা চাঁদ সদাগরের ঐতিহ্য নিয়ে। চণ্ডীমঙ্গলের এই বিদ্রোহী নায়কের চণ্ডী বিরোধিতার প্রকৃষ্ট কারণ নেই। বস্তুতঃ মানিক দত্ত, দ্বিজমাধব ও মুকুন্দের কাব্যের ধনপতির বিশেষ কোন বিশেষত্ব নেই, তেমনি এই যুগে রচিত মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের সঙ্গেও তার খুব পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। আসলে চৈতন্য-পূর্ব যুগের মানুষের যে অস্তিত্বের দায় ছিল, চৈতন্যপরবর্তীকালে সেই দায় আর ছিল না। ধর্মমঙ্গল কাব্যের ইছাই ঘোষ চরিত্রে দেব বিরোধিতা লক্ষ করা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্ব থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ চেতনা ভিন্নতর ছিল, সে কারণেই ইছাই ঘোষ প্রাণ দিলেও ধর্মদেবের আধিপত্য স্বীকার করে নি।

ভারতচন্দ্রের যুগ ঠিক দৈব মুখাপেক্ষী যুগ নয়। যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা ঠিক সে অর্থে না হলেও দৈবশক্তির প্রতি একান্ত নির্ভরশীলতা অষ্টাদশ শতাব্দীর মানব চরিত্রে নেই; যদিও একালে বাঙালীর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন নানাভাবে বিপন্ন তবু মানব চরিত্রের দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যাস কাহিনীতে। চাঁদ সদাগর ও ধনপতি যেখানে প্রবল পৌরুষ ও ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত দৈবশক্তির কাছে নতজানু, ভারতচন্দ্রের ব্যাস কিন্তু পৌরুষে উজ্জ্বল, অনেকটা

উন্নত শির মানুষ। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' এই প্রবাদবাক্যটি অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগগত বৈশিষ্ট্য বহন করে। তাই ব্যাস দৈবশক্তির দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েও কিন্তু আপন সংকল্পচ্যুত হয় নি। এই পৌরুষ ও উন্নত চেতনা অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগগত মূল্যবোধ। মনসামঙ্গল থেকে অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত কাব্যের দেবদ্রোহী নায়কদের বিবর্তনের ধারাটি লক্ষ করলে সমাজ বিবর্তনের রূপরেখাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চাঁদ সদাগর অপেক্ষা ব্যাস অনেক বিবর্তিত সমাজের আধুনিক মানুষ। এখানে সে দেবতার যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে।

মঙ্গলকাব্যের কবিগণ দৈবাদিষ্ট হয়েই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। দৈবাদেশ লঙ্ঘন করবার মত ক্ষমতা কবিদের ও সাধারণ মানুষের ছিল না। তাই দেবীর প্রতি কবির মনোভাব ভক্তির চন্দন তিলকে বিনম্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে ঘনরাম চক্রবর্তীই বোধহয় প্রথম মানুষের নির্দেশে কাব্য রচনা করলেন। তিনি গুরুর আদেশে লেখনী ধারণ করেন। আর ভারতচন্দ্র পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রের আদিষ্ট হয়ে কাব্য রচনা করেছেন, তাই যুগচেতনার নিরিখে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় এখানে পাওয়া গেল। তাই মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডী যেখানে বরাভয়দায়িনী, ভারতচন্দ্রের অন্নপূর্ণা সেখানে নিখিল জনের অন্নদাত্রী। মুকুন্দের চণ্ডী আরাধনা যেখানে অস্তিত্বের দায়ে, ভারতচন্দ্রের কাব্যে সেখানে শরণাগতির বালাই নেই। বরঞ্চ তিনি অন্নদাতা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে নতজানু, তাই তিনি দেবীর আদেশে কাব্য রচনা করেননি পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশেই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। বরঞ্চ দেবীকেও কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্রও দেবীর কাছে শরণাগত নন; অভাবে বা পীড়নে তিনি অন্নপূর্ণার আশ্রয় প্রার্থনা করেননি; তাঁর অন্নপূর্ণা পূজা রাজকীয় ঐশ্বর্যের প্রকাশ মাত্র। তাই অন্নদামঙ্গলে দেব বন্দনা অংশগুলিতে যেমন ভক্তির লেশমাত্র নেই, তেমনি সতীর দক্ষালয় যাত্রা, দক্ষের যজ্ঞনাশ, শিবের ধ্যানভঙ্গ, হরগৌরীর বিবাহ, সিদ্ধিঘোটনা বা হরগৌরীর সংসারযাত্রা বর্ণনায় অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজকীয় বিলাস-ব্যসন ও ভোগ-ঐশ্বর্যের প্রকাশ আছে।

মনসামঙ্গল থেকে অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত দীর্ঘ কয়েক'শ বছর ধরে রচিত কাব্যের কাব্য-দেহ রূপায়ণের বিবরণ প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতেই তুলে ধরা হয়েছে ব্যবহৃত সংস্করণ ধরে। সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তনের ক্ষেত্রে এই বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। পৃষ্ঠানুগ্রাহীতার কারণে কবিগণ একই কাব্য কাহিনী ধরেই কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু লক্ষনীয় ভৌগোলিক অবস্থান ও কালগত পার্থক্যে কাব্য-দেহ রূপায়ণে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। এই পার্থক্য অবশ্যই সমাজ-ভাবনাগত পার্থক্য। যেমন মনসামঙ্গলের ক্ষেত্রে চৈতন্য-পূর্ব যুগের তিন প্রধান কবি বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও বিপ্রদাস পিপিলাই, তিনজনেই হাসন-হোসেন পালা ব্যবহার করেছেন। বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাস হাসন-হোসেন পালার বিস্তৃত বিবরণ দিলেও নারায়ণ দেব অনুষঙ্গ মাত্র ব্যবহার করেছেন। আবার পরবর্তীকালের কবি ক্ষেমানন্দ, বংশীদাস ও বিষ্ণুপাল হাসন-হোসেন পালা ব্যবহার করলেও উত্তরবঙ্গের কবি জগজ্জীবন ঘোষাল ও তন্ত্রবিভূতির কাব্যে তা ব্যবহার করা হয়নি। আমার মনে হয় দক্ষিণবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কও ভাল ছিল না। আবার নারায়ণ দেব যে অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন সেখানে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক অনেক স্বাভাবিক ছিল। আবার কালগত বিবেচনায় চৈতন্যপরবর্তীকালের কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সুস্থতা লক্ষ করা যায়। পক্ষান্তরে চণ্ডীমঙ্গলে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি সহাবস্থানও একথা প্রমাণ করে। ধর্মমঙ্গলেও হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের চিত্র নেই। অন্নদামঙ্গলে ভবানন্দ মজুমদারের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের সম্পর্ক ধর্ম অসহিষ্ণুতার পরিচয় বহন করে. সুতরাং বলাই বাহুল্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুনরায় হিন্দ- মুসলমন সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। শুধু তাই নয়, হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যেও এই দ্বন্দ্ব দেখা যায়। মনসামঙ্গলে শিব-মনসার দ্বন্দ্ব, মনসা ও যমযুদ্ধ দু'টি সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব। চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডী ও শিবের দ্বন্দ্ব, ধর্মমঙ্গলে চণ্ডী ও শিবের দ্বন্দ্ব একই ধর্মের দু'টি সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব। ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গলে এবং রামকৃষ্ণ রায় ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য শিবায়নে বিষ্ণু জ্বর ও শিব জ্বরের যুদ্ধ প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনা

সপ্তদশ শতাব্দীতে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের দ্বন্দ্বকে চিহ্নিত করে। মুকুন্দ চক্রবর্তী দেব বন্দনার পাশাপাশি চৈতন্য বন্দনা করেছেন। বৈষ্ণব তীর্থস্থানের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং কাব্যের শেষে তিনি 'হরিনাম মাহাত্ম্য' বর্ণনা করেছেন। অপরপক্ষে ভারতচন্দ্র বৈষ্ণবতীর্থ নবদ্বীপে থেকেও সম্ভবত পোষ্টা মহারাজের অনুমতি না থাকায় চৈতন্য বন্দনা করেননি। বস্তুতঃ মুকুন্দ চক্রবর্তী স্বয়ং বৈষ্ণব ছিলেন। ভারতচন্দ্র জীবনের এক পর্বে বৈষ্ণব সাধুদের সংস্পর্শে এলেও বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেননি। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর কোন স্থির বিশ্বাস ছিল না।

যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাব্য পরিকল্পনা কি ভাবে প্রভাবিত হয়েছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় জগজ্জীবনের কাব্যে লখীন্দরের মাতুলানীর ইজ্জত হরণ বৃত্তান্তে। যা অন্য কবিগণ ব্যবহার করেন নি। এই ঘটনা এবং বিদ্যাসুন্দরে কামকেলির নির্লজ্জ বর্ণনা যুগ পরিবর্তনের উপস্থাপনা।

মুকুন্দ চক্রবর্তী ও ভারতচন্দ্রের কাব্যে সতীর দক্ষালয় গমনে অনুমতি গ্রহণ, দক্ষালয় যাত্রা, দক্ষের শিবনিন্দা, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ, মদনভস্ম, শিবের ধ্যানভঙ্গ, রতিবিলাপ, শিব বিবাহের মন্ত্রণা, শিব বিবাহ, হরগৌরীর সংসারযাত্রা অংশগুলিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে যা যুগরুচির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কাব্যদেহ রূপায়ণে, বিশেষত দেবখণ্ডের কাহিনীতে ভারতচন্দ্র মুকুন্দ চক্রবর্তীকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এই সৃষ্ট চরিত্র পরিকল্পনা লক্ষ করলেই সমাজ বিবর্তনের চেহারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুকুন্দ চক্রবর্তীর সময়কালে ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কাহিনীতে একটা ধর্মের ও নৈতিকতার আচ্ছাদন ছিল। ভারতচন্দ্র সে প্রয়োজন অনুভব করেন নি। ভারতচন্দ্রের সতী খানিকটা নারী চেতনায় জাগ্রত। তাই পিতৃগৃহে যাত্রাকালে বীভৎস্য মূর্তি প্রদর্শন আসলে নারীর বোধহয় খানিকটা আধিপত্য বিস্তার। আবার দক্ষের শিব নিন্দায় যেখানে মুকুন্দে আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্ব প্রধান, ভারতচন্দ্রে সেখানে সামাজিক কৌলীন্যের দ্বন্দ্ব বড় হয়ে উঠেছে। মদনভস্ম ও শিবের ধ্যানভঙ্গে ভারতচন্দ্র মুকুন্দের মত কার্তিকের জন্মের প্রয়োজন বোধ করেন নি। বরঞ্চ শিব ধ্যানভঙ্গের পর নারীসঙ্গ সন্ধান করে। ভারতচন্দ্র দেবতাকে নিয়ে বপ্রক্রীড়া করলেও একথা সত্য, তাঁর দেবাদিদেব অষ্টাদশ শতাব্দীর মোগল হারেম থেকে আগত রুচিবোধের দ্বারা পীড়িত। সুতরাং ভারতচন্দ্রের রতিবিলাপ কিংবা শিব বিবাহের শুভ উদ্দেশ্য নেই। তা দৈহিক কামনা-বাসনার নিবৃত্তিতেই ভরপুর। আবার ভারতচন্দ্র সৃষ্ট চরিত্রগুলি— ব্যাস, গঙ্গা, ব্রহ্মা, ঈশ্বরী পাটনী, অন্নপূর্ণা, শিব, বসুন্ধর, বসুন্ধরা, হরিহোড়, ভবানন্দ এবং বাদশা জাহাঙ্গীর পর্যন্ত প্রত্যেকেই অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ তাড়িত চরিত্র। নারীগণের পতিনিন্দা অংশে মুকুন্দের নারীরা গ্রাম্য নারী, এমন কি শ্রীমন্তের দ্বিতীয়া স্ত্রী সুশীলা পর্যন্ত গ্রাম্য নারী, আর ভারতচন্দ্রের নারীরা নাগরিকা. তাই মুকুন্দ যেখানে শুধুমাত্র কানা, খোঁড়া, অন্ধ, বধিরের স্ত্রীকে দিয়ে পতিনিন্দা করিয়েছেন, ভারতচন্দ্র সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সৃষ্ট নতুন নতুন চাকুরী বৃত্তিজীবী কর্মব্যস্ত রাজকর্মচারীদের স্ত্রীকে দিয়েও পতিনিন্দা করিয়েছেন. এখানে ভারতচন্দ্র নিজেকেও বাদ দেননি। প্রতিটি নারীর কথাবার্তায়, আবেগ-আক্ষেপে অষ্টাদশ শতাব্দীর নাগর সমাজের গলদ-গ্লানি চিত্ররূপ লাভ করেছে।

সর্বোপরি মনসামঙ্গল থেকে ধর্মমঙ্গল কাব্য পর্যন্ত যেখানে বিভিন্ন কবির মুখে সমাজ কথা বলেছে, ভারতচন্দ্রের কাব্যে কিন্তু কবি নিজের কথা, নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বর্ণনা করেছেন। উপযুক্ত ব্যক্তিত্ববোধের কারণে ভারতচন্দ্র-পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যের কবিগণ ছিলেন দর্শকমাত্র, ভারতচন্দ্র স্বয়ং সেখানে ব্যক্তিত্বমণ্ডিত কবি। ভারতচন্দ্র যা দেখেছেন জনরুচির তাগিদে তাকে পরিবেশন করেন নি। অন্যান্য কবিরা যেখানে একাধারে কবি ও গায়েন হওয়ায় তাঁদের জনরুচিকে রক্ষা করতে হয়েছে। ভারতচন্দ্র কিন্তু রাজসভার কবি হওয়ায় জনরুচি রক্ষার দায় তাঁর ছিল না, দর্শক হিসাবে তিনি দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে তুলে ধরেছেন। সেখানে অন্যান্য কবি অপেক্ষা ভারতচন্দ্র অনেক আধুনিক। কাব্যদেহে এই সামগ্রিক পরিবর্তনগুলি সমাজ বিবর্তনের ফলশ্রুতি। আর বিবর্তিত সমাজের ইতিহাসই কাব্যে রূপায়িত করেছেন ভারতচন্দ্র।

৩) জাতি-বৃত্তিগত বিবর্তন ঃ মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজ নানা ধর্ম ও বর্ণে বিভক্ত ছিল। সমাজের মূল নিয়ন্তা

ছিল ধর্ম এবং ধর্ম অনুযায়ী একই ধর্মের অন্তর্গত হলেও নানা বর্ণে সমাজ বিভক্ত ছিল। তবে লক্ষণীয়, সমগ্র মধ্যযুগ জাতপাত-ধর্ম-বর্ণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও সময়ের পরিবর্তনে তা এক রূপ ছিল না। জাতি ও বর্ণগত দিক থেকে বাঙালী সমাজ বৈদিক বর্ণাশ্রম প্রথার দ্বারাই বিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণই মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথার মূল ভিত্তি। বৈদিক যুগ থেকে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দনের কাল পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল।[৪৯] ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ হলেও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সঙ্গে আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতিগত দিক থেকে কোন পার্থক্য ছিল না। শূদ্ররা ছিল সমাজে অস্পৃশ্য, তাদের সঙ্গে কোন রকম সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান সম্ভব ছিল না। শূদ্রদের মধ্যে ছিল আবার এক শ্রেণীর অন্ত্যজ হিন্দু। এরা সমাজে 'পঞ্চম বর্ণ' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।[৫০] বর্ণ হিন্দুরা তাদের ঘৃণা করে এড়িয়ে চলত। লোকালয়ে তাদের প্রবেশাধিকার ছিল না, তাই এরা লোকালয়ের বাইরে দূরবর্তী স্থানে বসবাস করত। চর্যাপদে ডোম, শবর, ইত্যাদি অন্ত্যজ বর্ণের কথা পাওয়া যায়, যারা নগরের বাইরে বসবাস করত। কিন্তু মধ্যযুগে এসে সমাজ বিবর্তনের ফলে জাতিগত বিবর্তনের রূপরেখা পাওয়া যায়। বৈদিক সমাজব্যবস্থার চার বর্ণ ভেঙ্গে আরও নানা বর্ণে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সেন যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুণঃপ্রতিষ্ঠার ফলে ব্রাহ্মণের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য বর্ণগুলি অপেক্ষাকৃত হীন হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে যায়। বাস্তবে কিন্তু এমনটি হওয়া খুব একটা সম্ভবপর ছিল না। মুহম্মদ আবদুল জলিল লিখেছেন— "বাস্তবতার দিক থেকে তা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। তাই যথেষ্ট বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য, বৈশ্য-ব্রাহ্মণ প্রভৃতির বৈবাহিক মিলন ঘটতে থাকে। এই নিয়ম থেকে অনার্য শূদ্রেরাও বাদ যায়নি। তাদের সঙ্গেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বৈবাহিক মিলন হয়। এর ফলে চার বর্ণ বা জাতি ভেঙ্গে সৃষ্টি হয় বহুবর্ণ বা বহুজাতিক হিন্দু সমাজের।"[৫১]

বাঙালী সমাজে জাতি পরিচয় সম্পর্কিত দু'টি বিশিষ্ট গ্রন্থ হল বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ; যদিও এই দু'টি গ্রন্থের প্রামাণিকতা নিয়ে নানা ধরনের আলোচনার অবকাশ আছে। গ্রন্থ দু'টির রচনাকাল আনুমানিক দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি কালপর্ব ।[৫২] বৃহদ্ধর্মপুরাণ অনুসারে ব্রাহ্মণেতর সমস্ত জাতিকে ছত্রিশটি জাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে। ছত্রিশ জাতির মধ্যে প্রধান ছিল করণ ও অম্বষ্ঠ। অম্বষ্ঠরা বৈদ্য, এদের বৃত্তি ছিল চিকিৎসা, করণরা ছিল কায়স্থ, এরা প্রধানত রাজকার্য ও লিপিকার্য করত। তবে বৈদ্যরা কেউ কেউ বংশগত বৃত্তি ত্যাগ করে বিদ্যার্চ্চা করত। মধ্যযুগে কয়েকজন বিখ্যাত বৈদ্য কবি নাম পাওয়া যায়। অর্থ কৌলীন্যের জোরে এরা সমাজে বিশেষ সম্মানের অধিকারী হয়েছিল। অন্যান্যরা অরশ্য প্রত্যেকেই নানা বৃত্তিজীবী শ্রেণী। মিশ্রণের মাত্রার ভিত্তিতে সমাজে শ্রেণী নির্ধারিত হত, অই ছত্রিশ জাতি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা—

উত্তম সঙ্কর ঃ করণ, অম্বষ্ঠ. উগ্র, মাগধ, তন্তুবায়, নাপিত, গন্ধবণিক, গোপ, কর্মকার. তৌলিক, কুম্ভকার, কংসকার, দাস, শাঙ্খিক, বারুজীবী, মোদক, মালাকার, সুত, রাজপুত, তাম্বুলী ইত্যাদি।

মধ্যম সঙ্কর ঃ তক্ষক, রজক. স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক, তৈলকার, আভীর, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শাবাক, শেখর, জালিক ইত্যাদি।

অধম সঙ্কর ঃ মলেগ্রহি, কুড়ব. চণ্ডাল, বরুড়, তক্ষ, চর্মকার, ঘট্টজীবী, দোলাবাহী, মল্ল ইত্যাদি।

অধম সঙ্কররা অন্ত্যজ বর্ণ হিসাবে চিহ্নিত হত। বৃহদ্ধর্মপুরাণ অপেক্ষা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আরও সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ এই পুরাণ অনুসারে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল সঙ্কর বর্ণই শূদ্র হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। জল আচরণীয় শূদ্ররা সৎশূদ্র ও জল অনাচরণীয় শূদ্ররা অসৎশূদ্র বলে পরিগণিত হয়েছিল। এরা হল —

সৎশূদ্র ঃ করণ. অম্বষ্ঠ. নাপিত. গোপ, তাম্বুলী, স্বর্ণকার, মালাকার, কর্মকার. শঙ্খকার. তন্তুবায়. কুম্ভকার, কংসকার, চিত্রকার, সূত্রধর. কুবর, মোদক. ভিল্ল ইত্যাদি।

অসৎশূদ্র ঃ রাজমিস্ত্রী, কোটক. তীবর, তৈলকার, লেট, চর্মকার, শুঁড়ি, মল্ল. পৌণ্ড্রক, কসাই. কৈবর্ত, .বজক,

রাজপুত, কৌয়ালী, গঙ্গাপুত্র, যুগী ও আগরী ইত্যাদি।এছাড়া আরও কয়েকটি বর্ণ পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছে।

মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে এসে বাংলার জাতিগত বিন্যাসে আরো পরিবর্তন ঘটে। করণ ও অম্বষ্ঠদের পরে 'নবশাখ' বলে একটি নতুন সম্প্রদায়কে গণ্য করা হয়। গৌতম ভদ্র এসম্পর্কে লিখেছেন – "সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার গোপভূমে জঙ্গল হাসিল করে সদগোপরা গোরক্ষণ থেকে কৃষিকাজে মন দেয় এবং অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়। তখন মন্দির তৈরি করে ও জমি দিয়ে এই গোপরা তাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত নিয়োজিত করে এবং তারা 'নবশাখ' বলে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা পায়।"[৫৩] তিলি, মালী, তাম্বুলী, বারুজীবী, গোপ, নাপিত, কর্মকার, কুম্ভকার ও তন্তুবায় এই নয়টি সম্প্রদায় নবশাখের অন্তর্গত হয়। এরা ব্রাহ্মণদের কাছে একেবারে জলঅচল ছিল না। নবশাখ ছাড়া শাঁখার বণিক, ব্যাধ, ভড়, কোচ, কোল, জোলা, ডোম, নমশূদ্র, যুগী, কপালী প্রভৃতিরা ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের কাছে অস্পৃশ্য ছিল। অবশ্য মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে জন্মগত কৌলীন্যের বদলে অর্থ কৌলীন্য ও বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা কৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গোপ-সৎগোপ, জেলে কৈবর্ত-হেলে কৈবর্ত, হেলে কায়েৎ-মৎস্যজীবী কায়েতের পার্থক্য আসলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপর দাঁড়িয়েছিল। বাঙালী সমাজে বৃত্তিগত অবস্থান অত্যন্ত কঠোর ছিল, কিন্তু পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী থেকেই মোটামুটিভাবে বৃত্তিগত মিশ্রণ দেখা দিতে থাকে। ব্রাহ্মণরা কৃষিকার্য ছাড়াও সব রকম বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়। অর্থ কৌলীন্যের দ্বন্দ্ব সমাজে তীব্র আকার ধারণ করে।ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় এসম্পর্কে লিখেছেন— "তথাকথিত নিম্নজাতির লোকেদের মধ্যে গোপজাতির কিছু লোকের পশুপালন বৃত্তি ত্যাগ করে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের বাণিজ্যে মনোনিবেশ এবং তৈল ব্যবসাকে কেন্দ্র করে তেলি ভিন্ন কলু নামে একটি নতুন জাতির আত্মপ্রকাশ ষোড়শ শতাব্দীর বাংলায় একটি লক্ষণীয় সামাজিক পরিবর্তন।"[৫৪] সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীরে বিদেশী ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের আঘাত সমাজের পুরাতন মূল্যবোধকে নষ্ট করে দিয়েছিল। এভাবে উপজাতি ও নিম্নবর্ণের ভূমিজরাও অর্থনৈতিক উন্নয়নে, কখনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দাক্ষিণ্যে সমাজের নীচুতলা থেকে সামাজিক বর্ণ ব্যবস্থার উপরের স্তরে উন্নীত হয়। উচ্চবর্ণের রীতিনীতি ব্যবহার করার ফলে তারা তথাকথিত নিম্নবর্ণের চাইতে দূরে সরে যেতে থাকে। এভাবে অলক্ষে সামাজিক বিবর্তন ঘটে যেত। সুবর্ণ বণিক, গন্ধ বণিক, তিলি, গোপ, কর্মকার প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা মধ্যযুগের প্রথম থেকেই অর্থ কৌলীন্যের জোরে যথেষ্ট ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ভোগ করত। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে চতুর্দশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সামাজিক বিবর্তনের যে ধারা আমরা লক্ষ করি তার প্রধান বৈশিষ্ট হল বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া প্রবণতা। হিতেশরঞ্জন সান্যাল তাঁর "Social Mobility in Bengal" গ্রন্থে এই বিবর্তনের চারটি ধারা উল্লেখ করেছেন।[৫৫]

তাঁর মতে প্রথম প্রকার বিবর্তন হল, কোন একটা জাতির অভ্যন্তরস্থ বিবর্তন। একটা জাতির অন্তর্গত কুলীন সম্প্রদায় মৌলিক সম্প্রদায়ের তুলনায় অধিকতর মর্যাদা ও সম্ভ্রমের অধিকারী ছিল। যার ফলে মৌলিক থেকে কুলীনে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রবণতা জাতির অভ্যন্তরে দেখা দিয়েছিল। ময়রাদের মধ্যে এই প্রবণতা অধিক পরিমানে লক্ষ করা যায়। উন্নত ময়রা কুলীনদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করে এবং কৌলীন্য দাবী করে। প্রাচীন কুলীনদের মধ্যে এই আগন্তুক শ্রেণীকে সমমর্যাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধা ও কুণ্ঠা ছিল।

দ্বিতীয় প্রকার বিবর্তনে. আচার অনুষ্ঠানের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কেবল উন্নত সামাজিক মর্যাদার দাবী করে, নবশাখ. গন্ধবণিক ও তাম্বুল বণিকগণ আর্থিক উন্নতির ফলে বারুই, কর্মকার. নাপিত ও অন্যান্যদের তুলনায় অধিক সম্মান দাবী করত।

তৃতীয় প্রকার বিবর্তন ঘটে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির সামাজিক মর্যাদা আদায়ের জন্য নতুন নাম ধারণের প্রবণতার মধ্যে দিয়ে। যেমন বিদ্রোহী নাপিত. ধোবা ও শুঁড়ি সম্প্রদায় তাদের নামের আগে 'মধু' , 'ফুল' প্রভৃতি শব্দ বসিয়ে উন্নত সামাজিক মর্যাদা দাবী করে। মধুনাপিত, ফুলনাপিত, চাষাধোবা, সৎচাষী, প্রকৃত সৎচাষী. বরেন্দ্র শুঁড়ি প্রভৃতি

নামকরণ এর দৃষ্টান্ত। এসব নতুন নামকরণের মাধ্যমে তারা তাদের জাত ভাইদের থেকে নিজেদের পৃথক করে নেয়। বীরভূম, নদীয়া, যশোর, হুগলী, চব্বিশ পরগণা জেলাতেই প্রধাণত এই সম্প্রদায়কে লক্ষ করা যায়।

চতুর্থ প্রকার বিবর্তন ঘটে নতুন জাতির উদ্ভব এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের ভিন্নতার মধ্যে দিয়ে। এই আচার অনুষ্ঠান তাদের আদি সম্প্রদায় থেকে নিজেদের পৃথক করে দেয়। গোপ, তেলি ও ভূমিজদের মধ্যে এই বিবর্তন অধিক পরিমানে লক্ষ করা যায়। দক্ষিণ পুরুলিয়া এবং সিংভূম জেলার কিছু অংশের কোন কোন ভূমিজ সম্প্রদায় নিজেদের ক্ষত্রিয় ও রাজপুত বলে ঘোষণা করে।

উক্ত চার প্রকার বিবর্তনের মধ্যেই জীবিকার পরিবর্তন ও উন্নত জীবিকা প্রধান নিয়ামক রূপে কাজ করে।শ্রীচৈতন্যদেবের মানবতাবাদী ধর্ম আন্দোলন গোঁড়া হিন্দুসমাজে প্রাণ সঞ্জীবনী মন্ত্র শোনায়। এর ফলে তথাকথিত বর্ণভিত্তিক ঘৃণা-বিদ্বেষ লোপ পেতে থাকে। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর বৈষ্ণব সমাজ গণমুখী চেতনাকে হারিয়ে ফেলে। তবু বলা যায় বৈষ্ণবধর্ম স্থবির-গতিহীন হিন্দুসমাজে অভূতপূর্ব গতিশীলতার সৃষ্টি করেছিল। ফলে সপ্তদশ শতাব্দীতে জাতিভেদ অপেক্ষা প্রাণের মূল্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলে তাই জনৈকা বৃদ্ধার মুখে শোনা যায়—

"বৃদ্ধা বলে প্রাণ হৈতে জাতি নাহি বড়।" (জগজ্জীবন/১৪৬)

মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় মনসামঙ্গল থেকে অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত এই বর্ণাশ্রমিক সমাজ আদর্শই দেখা যায়। মনসামঙ্গলে অবশ্য তেমনভাবে জাতি-বৃত্তির পরিচয় নেই। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে লখীন্দরের বিবাহ অংশে শোভাযাত্রায় নানা বৃত্তিজীবী শ্রেণীর উল্লেখ দেখা যায়। বিপ্রদাস পিপিলাই- এর মনসাবিজয় কাব্যে মনসার সিজুয়া পর্বতে বসতি স্থাপনে বৃহদ্ধর্মপুরাণোক্ত ছত্রিশ জাতির কথা উল্লেখ থাকলেও তার কয়েকটির নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের পরে ক্ষেত্রি, বৈশ্য, বৈদ্য, কায়স্থ, ভট্ট, দৈবজ্ঞ, গোপ, বারই, কুমার, পঞ্চবণিক, কর্মকার এবং অন্যান্য জাতির মানুষ বাদ্যপূরক, কলু, কুশলি, কাঠুর‍্যা, শাঁখারি, কাঁসারি, মালাকার, রজক, নাপিত, ছুতার, গাড়ার, ধীবর, তিয়র, মালা ইত্যাদি জাতির উল্লেখ আছে। মুকুন্দ চক্রবর্তী জাতিবৃত্তিগত পরিচয় উপস্থাপিত করতে গিয়ে ব্রাহ্মণদের গাঞি, গোত্র. পদবী সমেত উল্লেখ করেছেন। ব্রাহ্মণরা প্রধানত জ্ঞানচর্চা করত, আর মুর্খ বিপ্ররা যজমানী করত। তবে বৈদিক জীবনচর্যানুসারে নির্ধারিত শুধুমাত্র জ্ঞানচর্চা বা যজমানীবৃত্তি দ্বারা চলত না, তাই ব্রাহ্মণের কৃষিকার্যের পরিচয় পাওয়া যায় মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। মুকুন্দ চক্রবর্তী স্বয়ং নিজের কৃষিকাজের উল্লেখ করেছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী কাব্যে ব্রাহ্মণদের তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন— গ্রহ-বিপ্র, বর্ণ-বিপ্র এবং অগ্রদানী-বিপ্র। গ্রহ-বিপ্ররা দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তারা শিশুদের কোষ্ঠী তৈরী করত, কুল পাঁজি বিচার করত। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বর্ণ-বিপ্রদের সম্পর্কে বলেছেন – "সম্ভবত যে সব বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা হিন্দু সমাজে পুরাপুরি গৃহীত হইত না এবং সাধারণ ব্রাহ্মণেরা তাহাদের পৌরোহিত্য করিত না। এইজন্য বৌদ্ধমঠের শ্রমণেরাই তাহাদের পৌরহিত্য করিত এবং বর্ণ-বিপ্র নামে পরিচিত হইত।"[৫৬] মুকুন্দ চক্রবর্তী যাদের মুর্খ-বিপ্র বলেছেন তারা হল অগ্রদানী-বিপ্র; এরা যজমানী বৃত্তি ও মৃত্যুকালীন শ্রাদ্ধের অগ্রদান গ্রহণ করত। এরা ব্রাহ্মণ সমাজে অস্পৃশ্য ছিল। ব্রাহ্মণদের আরও তিনটি উপশ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলি হল— বারেন্দ্র, রাঢ়ী ও বৈদিক। কুলেশীলে বারেন্দ্রী ব্রাহ্মণরাই শ্রেষ্ঠ ছিল। মুকুন্দ চক্রবর্তী এই ব্রাহ্মণদের উল্লেখ করেছেন। এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা বাংলার বাইরে থেকে আগত।[৫৭]

ক্ষত্রিয়রা ছিল যুদ্ধ ব্যবসায়ী। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে এবং ভারতচন্দ্রের কাব্যে মল্লবিদ্যা শিক্ষাদানকারী, যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয় ও রাজপুত জাতির উল্লেখ আছে। তবে মধ্যযুগে ক্ষত্রিয় ও রাজপুতদের স্থান কায়স্থের নিম্নে বলে গণ্য হত। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে কালকেতু ভাঁড়ুদত্তকে তিরস্কার করে বলেছে—

"হয়ে তুই রাজপূত বলাস কায়স্থ-সুত

নীচ হয়ে উচ্চ অভিলাষ।
সেবকের যোগ্য নও কুটুম্ব করিয়া কও
কুলের মহিমা কৈল নাশ॥" (মুকুন্দ/৮৭)

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় ক্ষত্রিয়দের অস্ত্রচালনা ও যুদ্ধবৃত্তি গ্রহণ করতে। তাছাড়াও শূদ্রবর্ণ এমন কি অন্ত্যজ বাগদী, হাড়ী, ডোম, চণ্ডালরা যুদ্ধবৃত্তি গ্রহণ করেছিল। ধর্মমঙ্গলে ডোমদের যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতার কথা পাওয়া যায়। তাছাড়াও তারা কৃষিকার্য করত। অবশ্য যুদ্ধবিগ্রহে উগ্র ক্ষত্রিয় বা 'আগরি'দের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। মধ্যযুগে রচিত কোন কোন গ্রন্থে কায়স্থদের ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করতে দেখা যায়। নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস গ্রন্থে বলা হয়েছে –

"সৌভরির ভৃত্যের নাম কালিদাস মিত্র।
যোদ্ধৃবেশধারী এই পঞ্চ ভৃত্য হন ক্ষত্র॥
ক্ষত্রিয় কায়স্থ এই ভৃত্য পঞ্চজন।
পঞ্চ ঋষের সঙ্গে গৌড়ে করিল গমন॥"[৫৮]

ক্ষত্রিয়রা মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় খুব একটা সম্মানের অধিকারী ছিল না তা বেশ বোঝা যায়। বৈশ্যরা কৃষিকার্য করত। এরা মূলত বিভিন্ন বৃত্তিজীবী শ্রেণী। বৈদ্যরাও বৈশ্যের অন্তর্গত ছিল। মধ্যযুগে কায়স্থদের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। বর্ণাশ্রমশাসিত হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থরাই ছিল মূল নিয়ন্তা। অবশ্য কায়স্থরাও নানা ভাগে বিভক্ত ছিল, এগুলি হল— রাঢ়ী, বারেন্দ্র এবং বঙ্গজ।[৫৯] তার মধ্যে কতিপয় কায়স্থরা অর্থ কৌলীন্যে হীন ছিল, একারণে এই ধরনের বাহাত্তর রকমের কায়স্থকে 'বাহত্তরে কায়স্থ' বা হীন কায়স্থ বলে চিহ্নিত করা হত। ভারতচন্দ্র হরিহোড়কে 'বাহত্তরে কায়স্থ' বলে উল্লেখ করেছেন। তবে অর্থ কৌলীন্যের জোরে এরা উন্নত হতে পারত। সমাজে কাঞ্চনমূল্য কতটা স্বীকৃত হয়েছিল অন্নদার নিজস্ব উক্তি থেকে তা বোঝা যায়। হরিহোড় বাহত্তরে কায়স্থ অর্থাৎ নীচু শ্রেণীর কায়স্থ, কারণ তার সম্পদ নেই এবং ঐ শব্দবন্ধটি একটি গালি হিসাবে সমাজে ব্যবহৃত হত। হরিহোড় মৌলিক কায়স্থ হওয়া সত্ত্বেও -

"বাহত্তরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে।
বসিতে না পান ভাল কায়স্থের কাছে॥" (ভারতচন্দ্র/১৪০)

কিন্তু, দেবী তাকে অর্থ কৌলীন্য দিয়ে বলেছিল—

"ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইবেক ঘর।
কুলীন কায়স্থ সব দিবে কন্যা বর॥" (ঐ)

দেবীর এই উক্তি অসম্ভবভাবে সত্য প্রমাণিত হয়। হরিহোড়ের অর্থ কৌলীন্যে তার কুল-কলঙ্ক মুছে গেল, উচ্চবর্ণের সমাজে তার মর্যাদা ফিরে এল—

"এইরূপে হরিহোড় পেয়ে ধন বর।
ধনধান্যে পরিপূর্ণ কুবেরসোঁসর॥
কুলীন মৌলিক যত কায়স্থ আছিল।
নানামতে ধন দিয়া সকলে তুষিল॥
ঘটক পাইয়া ধন গাইল ঠাকুর।
বাহত্তরে গালি ছিল তাহা গেল দূর॥
ঘোষ বসু মিত্র মুখ্যকুলীনের কন্যা।
বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা॥"(ঐ/১৪৭)

বস্তুতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈদিক বর্ণাশ্রম লুপ্ত হয়ে মিশ্র বৃত্তি ও মিশ্র জাতি তৈরী হয়েছিল, ফলে মানুষের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,শূদ্র পরিচয় রইল না, বৃত্তিজীবীতারক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে মিশ্র বৃত্তি জীবীতার সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজে অর্থ ও গুণাবলী অনুযায়ী সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।ভারতচন্দ্রের সময়কাল অর্থাৎ অষ্টাদশ্ শতাব্দীর প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে তৎকালীন যুগগত প্রবণতাটি সুন্দরভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ভারতচন্দ্র যে ছত্রিশ জাতির নাম তুলে ধরেছেন তারা হল— চণ্ডাল, কুরমী, কোরঙ্গা, পোদ, কপালী, বাজীকর, পটুয়া, বাইতি, কসবি, ভক্তিয়া, ভাঁড়, নর্তক ইত্যাদি। এরা নিজ নিজ বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল। এসমস্ত বৃত্তিধারী জাতির জন্যই গ্রামীণ সমাজ স্বনির্ভর ছিল। মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে এসে দ্রুত বৃত্তি পরিত্যাগের ফলে গ্রামীণ সমাজের ভিত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। নবাবী আমলের শেষে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবেশ করলে পেশাজীবীরা তাদের বংশানুক্রমিক পেশা চাকুরীর লোভে পরিত্যাগ করলে আত্মনির্ভরশীল গ্রামীণ সমাজের ভিত ভেঙ্গে পড়েছিল। আসলে দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় বর্ণাশ্রম তার কঠোরতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি।

মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজে জনবিন্যাস ও বসতি স্থাপনের চিত্র পাওয়া যায় বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে। তা-ও কালগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই নানা বর্ণে, গোত্রে বিভক্ত হিন্দুসমাজে জাতিভেদ অত্যন্ত কঠোরভাবে পালিত হত। উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে কোনরকম সাংস্কৃতিক ও সামাজিক যোগাযোগ ছিল না। নগর বিন্যাসে বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে এই কঠোরতা বিশেষভাবে রক্ষা করা হত। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ থেকেই এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণত উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণগণ নগরের কেন্দ্রস্থলে বসবাস করত এবং জাতিব্যবস্থার নিম্নস্তরে অবস্থিত অন্ত্যজরা অপেক্ষাকৃত নগরের বাইরের দিকে বসবাস করত। 'নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ' কিংবা 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিগুলি সেকথা প্রমাণ করে। মধ্যযুগের প্রথম পর্বেও এই চিত্রই দেখা যায়। তুর্কী আক্রমণের ফলে নবাগত মুসলমানরা ছিল এদেশীয়দের চোখে যবন বা বিধর্মী। সুতরাং দু'টি ভিন্ন সংস্কৃতিগত জাতির সহাবস্থান সম্ভব ছিল না। মনসামঙ্গলে হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক গ্রামে পৃথক এলাকায় বসতি স্থাপনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। মালাপাড়া, বারুইপুর, রাখালগাছি হিন্দুর গ্রাম। বলাই বাহুল্য এই গ্রামগুলি মালো, বারুই, গোয়ালা ইত্যাদি তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষের বাসস্থান। আবার হাসনহাটি মুসলমানদের গ্রাম। একমাত্র বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে সিজুয়াতে মনসার বসতি স্থাপনের চিত্র পাওয়া যায়। লক্ষ্মীয় এই বর্ণনায় মুসলমান জনবসতির চিহ্ন নেই। আবার বিজয়গুপ্ত ও জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে লখীন্দরের বিবাহে বরযাত্রাকালে বিভিন্ন জাতির মানুষের ভীত হয়ে পলায়নের চিত্র পাওয়া যায়। তাতে মুসলমানের উল্লেখ নেই। এই চিত্র বেশীর ভাগই অন্ত্যজ শ্রেণীর বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের চিত্র।

ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাবল্যে জাতিব্যবস্থার গোড়ায় ভাঙন ধরেছিল। স্বয়ং চৈতন্যদেব যবন হরিদাসকে আলিঙ্গন দান করেছিলেন এবং পানিহাটিতে পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসে জাতপাতের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন, আর তাঁর কীর্তনের আসরগুলি ছিল সকল ধর্ম ও সকল জাতির মানুষের মিলনক্ষেত্র। মুকুন্দ চক্রবর্তী অনেকটা মুক্ত সমাজের মানুষ ছিলেন। তিনি কালকেতুর আদর্শ রাজ্যে সকল ধর্মের, সকল বর্ণের মানুষকে স্থান দিয়েছেন। তাই গুজরাট নগরে হিন্দু সমাজব্যবস্থার সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে মুসলমানেরও সমাগম ঘটিয়েছেন, যদিও শাসক শ্রেণীর ক্ষমতাপুষ্ট মুসলমানগণ প্রচুর ক্ষমতা ভোগ করত। কালকেতুর গুজরাট নগরে সকল শ্রেণীর মানুষের সমাগম হলেও তারা একই গ্রামের পৃথক অঞ্চলে জাতি-বৃত্তি অনুযায়ী বসবাস করত এরকম বিবরণ পাওয়া যায়। কবি অত্যন্ত সন্তর্পণে প্রথমে ব্রাহ্মণ, তারপর ক্ষত্রিয়, তারপর বৈশ্য ও কায়স্থ এবং শেষে অপরাপর শূদ্র ও ইতর জাতির মানুষের সমাগম বর্ণনা করেছেন। মুকুন্দের দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তব ছিল বলেই তিনি লক্ষ করেছিলেন হিন্দুর জাতিব্যবস্থা মিশ্রিত হয়ে যাচ্ছে। তাই সামাজিক কৌলীন্য অপেক্ষা বাস্তব প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী

মানুষের পাশাপাশি বসবাসের চিত্র এঁকেছেন। তাই বৈদ্যগণের পাশে অগ্রদানী ব্রাহ্মণের বসতি স্থাপনের চিত্র ঐতিহাসিক ভাবে সত্য। এমনকি সেবক শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন বৃত্তির শূদ্র, জায়াজীবী বা পতিতাদেরও নগরে বসতি স্থাপনের চিত্র তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ একই নগরের নির্দিষ্ট এলাকায় স্বীয় বৃত্তি ও ধর্মাচরণ করতে পারত। সুতরাং বলা যায় ষোড়শ শতাব্দীতে গ্রামীণ জীবন প্রভাবিত নাগরিক সমাজের জনবিন্যাসে বিবর্তিত সমাজের চেহারা পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে ইছাই ঘোষের ত্রিষষ্ঠী নগরে বসতি স্থাপনের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে আদিবাসী কিরাত শ্রেণীর উল্লেখ আছে। লাউসেন অন্ত্যজ ডোমশ্রেণীর মানুষদের সামাজিক কৌলীন্য প্রদান করে ময়না নগরে নিয়ে গিয়ে বসতি দেয়। এই দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে জনজীবন ধীরে ধীরে মিশ্রিত হয়ে যাচ্ছে। ভারতচন্দ্র বর্ধমান নগরের জনবিন্যাসের যে বিবরণ দিয়েছেন, সকল জনজাতির মানুষ সেখানে মিশ্রভাবে বসতি স্থাপন করেছে। শুধু হিন্দুমুসলমান ও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ই নয়, ইউরোপ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত মানুষের এখানে পাশাপাশি বসবাসের চিত্র এঁকেছেন। ভারতচন্দ্র শুধু ভাষা ব্যবহারে 'যাবনী মিশাল' করেন নি, জনবিন্যাসেরও 'যাবনী মিশাল' বিবরণ দিয়েছেন। জীবন মৈত্রের মনসামঙ্গলে কামগঞ্জে লখীন্দরের প্রজাপত্তনেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মিশ্র জনবিন্যাস দেখা যায়। সুতরাং সমাজ বিবর্তিত না হলে, চেতনাগত বিবর্তন না হলে কবিগণের এই সমস্ত বিবরণ দেওয়া সম্ভব হত না।

ব্রাহ্মণরা সমাজের মধ্যমণি হিসাবে নগর বা গ্রামের কেন্দ্রস্থলে বসবাস করলেও সামাজিক মর্যাদা অনুসারে ক্ষত্রিয় কায়স্থ, বৈদ্য ও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষরা বসবাস করত। তবে অন্ত্যজ ও পতিতারা সাধারণত নগরের বাইরে একাংশে বসবাস করত। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জনবিন্যাসের এ চিত্রই পাওয়া যায়। তবে লক্ষণীয় বিষয়, ষোড়শ শতব্দীতেই সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী শ্রেণীর পাশাপাশি বসতি স্থাপনের চিত্র পাওয়ায় যায়। তাই মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে বৈদ্যগণের পাশে অগ্রদানী ব্রাহ্মণের বসবাসের চিত্র আছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতব্দীতে কিন্তু শুধুমাত্র জাতি কৌলীন্য অনুসারে বসতি স্থাপন হয়নি। ভারতচন্দ্রের কাব্যে বর্ধমান নগরে হিন্দু, মুসলমান, ইউরোপীয় বণিকগণের একত্র বসবাসের কথা পাওয়া যায়। মনসামঙ্গলে যেখানে হিন্দু-মুসলমান পৃথক এলাকায় পৃথক গ্রামে বসবাস করত মুকুন্দের কাব্যেই সেখানে একই নগরে পৃথক এলাকায় বসতি স্থাপনের কথা পাওয়া যায়। আবার ভারতচন্দ্রের কাব্যে একই এলাকায় পাশাপাশি বসবাসের চিত্র পাওয়া যায়, এবং এখানে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের এক সঙ্গে বসবাসের বিবরণ পাওয়া যায়।

মঙ্গলকাব্য এবং মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্য শাখায় বাঙালী মুসলমান সমাজ সম্পর্কেও কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। হিন্দু সমাজের মত মুসলমান সমাজও নানা জাতি ও বর্ণে বিভক্ত ছিল। হিন্দুর চার বর্ণের মত মুসলমান সমাজ পাঁচটি বর্ণে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, এরা হল— সৈয়দ, শেখ, মোগল, পাঠান ও দেশজ। সৈয়দ, শেখ, মোগল ও পাঠানরা বিভিন্ন কর্মসূত্রে এদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছিল।[৬১] দেশজ মুসলমানরা ধর্মান্তরিত হিন্দু। বহিরাগত এসমস্ত মুসলমানরা অর্থ-সম্পদ থাকায় ও শাসকের ক্ষমতাপুষ্ট হওয়ায় নিজেদের অভিজাত বলে মনে করত। দেশজ ধর্মান্তরিত মুসলমানদের তারা অবজ্ঞার চোখে দেখত এবং বর্ণহিন্দু ও নিম্নবর্ণের হিন্দুর মত বহিরাগত মুসলমানদের সঙ্গে দেশজ মুসলমানদের কোন প্রকার সামাজিক সম্পর্ক থাকত না। অবশ্য পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন এদেশে বসবাসের ফলে তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং হিন্দু কুলীনের মত মুসলমান সমাজেও পেশা, অর্থ ও বিদ্যাবুদ্ধিগত আভিজাত্যের পরিবর্তে শুধুমাত্র বংশগত কৌলীন্য স্থাপিত হয়, যা বংশ পরম্পরায় চালিত হয়ে আসতে থাকে। অবশ্য মুসলমান সমাজের এই কৌলীন্য চেতনা হিন্দুসমাজের প্রভাবের ফল বলে মনে করা যায় আসলে হিন্দুসমাজের এই কৌলীন্য চেতনা ধীরে ধীরে মুসলমান সমাজে প্রবেশ করেছিল।[৬২] ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে রচিত কাব্যগুলিতে এই বিবরণ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কালকেতুর গুজরাট নগরে মুসলমানগণের আগমন উপলক্ষে এসব অভিজাত

মুসলমানের আগমনের কথা বলা হয়েছে এবং তারপর দেশজ ধর্মান্তরিত মুসলমানদের আগমনের কথা বলা হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকান রাজসভার কবি আরাকান রাজসভায় যে সমস্ত প্রভাবশালী মুসলমানদের কথা বলেছেন তারা হল— সৈয়দ, কাজী, শেখ, মোল্লা, আলীম, ফকির ইত্যাদি। কবির বর্ণনায়—

"সৈদয় কাজী শেখ মোল্লা আলীম ফকির।
পূজেন্ত সে সব যেন আপনা শরীর॥" (লোরচন্দ্রানী ও সতী ময়না/৬)

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্র সুন্দরের বর্ধমান প্রবেশ অংশে বর্ধমান গড় বর্ণনায় যে সমস্ত অভিজাত মুসলমানের কথা বলেছেন তারা হল – সৈয়দ, মল্লিক, শেখ, মোগল পাঠান ইত্যাদি। এসমস্ত অভিজাত মুসলমানরা রাজকার্য ছাড়াও ধর্মকর্ম ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করত। মুকুন্দ চক্রবর্তী এদের প্রসঙ্গে বলেছেন – তারা সকাল থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ করে, রোজা করে, সোলেমানি মালা বা তসবী জপ করে এবং পীর পয়গম্বরের মোকামে বাতি জ্বালে। এসমস্ত আচরণের অনেকটা হিন্দুসমাজ থেকে মুসলমান সমাজে প্রবেশ করে থাকবে। তবে অবশ্য কিছু মুসলমান গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণদের মতই অনেকাংশে ঠক, প্রবঞ্চক, ধর্মধ্বজী ও হিন্দু বিদ্বেষী ছিল। পাঠান মুসলমানদের মধ্যেও আবার নানা ভাগ ছিল, যেমন— সাবানি, লোহানি, লোদানি, সুরয়ানি ইত্যাদি। দেশজ মুসলমানরা ধর্মান্তরিত হবার আগে হিন্দুসমাজে নানা বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল। ধর্মান্তরিত হবার পরও তারা তাদের জাতিগত বৃত্তি ত্যাগ করতে পারেনি। কাজেই হিন্দুসমাজের অনুরূপে মুসলমান সমাজেও বৃত্তিজীবী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। বাঙালী সমাজে এটা একটা বড় ধরনের বিবর্তন বলে মনে করা যেতে পারে। কবিকঙ্কণের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী এসব বৃত্তিজীবী মুসলমানরা হল – গোলা, জোলা, মুকেরি, পিঠারি, কাবাড়ি, গরসাল, সানাকার, হাজাম, কাগজী, তীরকর, কলন্দর, দরজী, বেনটা, রঙ্গরেজ, হালান, কসাই ইত্যাদি। এগুলি ছাড়া আরও কিছু বৃত্তিজীবী শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন— ঢালী, নিশা, মুলঙ্গি, কলু, মালী, ধোপা, নাপিত, বেদে, বাজিকর, বৈদ্য, ব্যাধ, ঢুরিয়া ইত্যাদি।[৬৩] আবার হিন্দুসমাজের মতই যে সমস্ত মুসলমানরা রাজকর্মচারী ছিল তারাও পরবর্তীকালে তাদের নাম পদবীর মধ্যে তাদের বৃত্তিগত পরিচয় উল্লেখ করত, যেমন – কাজী, খাঁ, চৌধুরী, তালুকদার, মল্লিক, সরকার, মণ্ডল, মিঞা, মুন্সী, মির্জা, বেগ, লস্কর, বখ্শী, পাটোয়ারী, ব্যাপারী, পসারী ইত্যাদি। অবশ্য হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এসমস্ত পদবী ব্যবহার করতে দেখা যায়। বস্তুত সমাজ বিবর্তিত না হলে এই ধরনের প্রবণতা দেখা যেত না।

৪) রাজনৈতিক বিবর্তন : মধ্যযুগের সাধারণ মানুষ ছিল সহজ, সরল এবং তারা রাজনীতি সচেতন ছিল না। অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ম্ভর গ্রাম জীবনে সাধারণ মানুষ শাসকের রক্তচক্ষু এড়িয়ে নিরুপদ্রব জীবন-যাপন করত। উৎসব অনুষ্ঠানে, আমোদে, প্রমোদে গা ভাসিয়ে অলস-ভাববিলাসী জীবন-যাপনে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের জীবন থেকে শত যোজন দূরবর্তী অঞ্চলে শাসককুলের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে তারা অংশগ্রহণ করত না, এমনকি তাদের অভ্যস্ত নিরুপদ্রব জীবনে তার কোন প্রভাবও ফেলত না। সুতরাং কাদের দ্বারা তারা শাসিত হচ্ছে তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা ছিল না। তবে কখনো কখনো রাজনৈতিক বিপর্যয় নেমে এলে অদৃষ্টবাদী বাঙালী অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করত। পূর্বেই বলা হয়েছে মঙ্গলকাব্যের কবিগণ গ্রামসমাজেরই কবি। কবিরা কেউ কেউ গায়েন ছিলেন, তাই মন্দিরা বাজিয়ে, চামর ঢুলিয়ে তারা গ্রামীণ মানুষের মনোরঞ্জন করতেন। তাঁরাও রাজনীতি সচেতন ছিলেন না। রাজরাজার ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী নিয়ে কেউ কাব্য রচনা করেন নি। কেউ কেউ রাজা বা জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেও একমাত্র ভারতচন্দ্র ব্যতীত কোন কবিই কাব্যে পৃষ্ঠপোষককে প্রাধান্য দেন নি। তবে কখনো কখনো তাদের নামোল্লেখ মাত্র করেছেন। সুতরাং মঙ্গলকাব্যগুলিতে রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস প্রাধান্য পায় নি। সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে আভ্যন্তরীণ রাজনীতি। তাছাড়া বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের বিষয়বস্তু সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন, তাই রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস আলোচ্য নয়। কিন্তু চতুর্দশ-পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ

শতাব্দী পর্যন্ত রাষ্ট্রনৈতিক ওঠাপড়া জনজীবনকে কিভাবে কতখানি প্রভাবিত করেছে তার একটা বিবর্তিত চেহারা তুলে ধরা হল।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের বিবরণ পাওয়া না গেলেও কবিগণ পৃষ্ঠপোষকের নামোল্লেখ করেছেন, কেউ কেউ দূর থেকেই তাদের কথা শুনে তৃপ্ত হয়েছেন। মনসামঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের কাব্যে সুশাসক হিসেবে হুসেন শাহের নামোল্লেখ, ক্ষেমানন্দের কাব্যে বারা খাঁ, জগজ্জীবনের কাব্যে দিনাজপুরের মহারাজা প্রাণনাথের কথা পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলের কবি দ্বিজমাধব আকবর বাদশাহের নামোল্লেখ করেছেন, মুকুন্দ চক্রবর্তীর আত্মবিবরণী মধ্যযুগে সর্বাপেক্ষা তথ্য সমৃদ্ধ দলিল। ঘনরাম চক্রবর্তী কীর্তিচন্দ্রের নাম করেছেন, ইনি বর্ধমানরাজ ছিলেন। শিবায়নের কবি রামকৃষ্ণ রায় বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের দ্বারা কিভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিলেন তার বিবরণ দিয়েছেন। ভারতচন্দ্রে এসে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের প্রত্যক্ষ বিবরণ পাওয়া গেল। সাহিত্যে রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রবেশ এই প্রথম। আধুনিক চিন্তায় ভাবিত বাস্তববাদী ভারতচন্দ্র শাসকের ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী কাব্যের বিষয়বস্তু করে তুললেন। সমাজ ইতিহাসের বিবর্তনে এটি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

তুর্কীর মত বিদেশী শক্তির আকস্মিক আঘাতে বিমূঢ় বাঙালী কমঠবৃত্তি অবলম্বন করেছিল। নবাগত তুর্কীরা শক্তির মহোৎসাহে মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ এবং হিন্দু কাফেরদের ইসলামে দীক্ষিত করার পবিত্র চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। বিপর্যস্ত বাঙালী সুধী সমাজ সেদিন তাঁদের সাহিত্যকে রক্ষা করার জন্য অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছিলেন আর এভবেই রক্ষা পেয়েছিল চর্যাপদের মত উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। কিন্তু শাসকের ভাগ্যও সুখ শয্যায় ছিল না। তাঁরা ক্রমাগত হানাহানি ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। এমতাবস্থায় সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। প্রায় দেড়'শ বছর বাংলার বুকে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম ছিল - বাংলার সংস্কৃতি নিষ্ফলা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এরপর সুদিন ফিরে এলেই সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের দ্বারা নতুন জাতির সৃষ্টি হল, নতুন উদ্যমে বাংলার সংস্কৃতি জাগ্রত হবার প্রয়াস পেল। বাঙালী সমাজ এই প্রথম কূপমণ্ডুকতা মুক্ত হয়ে বহির্বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হল। সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক বিবর্তনে সামাজিক বিবর্তন অনিবার্যভাবে ঘটে যেতে লাগল।

মনসামঙ্গল কাব্যে দেখা যায় রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগে ও শাসক শক্তির মদতপুষ্ট হয়ে নবাগত মুসলমানরা হিন্দুর জনজীবনকে বিপর্যস্ত করেছে। যদিও হিন্দু সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে সেই বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। মনসামঙ্গলে হাসন-হোসেন পালায় মুসলমান কাজীর সঙ্গে রাখালদের দ্বন্দ্ব এবং হাসন-হোসেনের সঙ্গে মনসার বিবাদ হিন্দু জমিদার ও মুসলমান শাসকের প্রতিপত্তি বিস্তারের কাহিনী। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হলেও জনজীবন রাজনৈতিক আবর্ত সঙ্কুলতার দ্বারা অনেক বেশী পীড়িত হয়েছে। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে শাসনকার্যের সুবিধার্থে নতুন বিধি প্রণয়ন সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারে নি। তাকে শাসকের দুরাচার বলে মনে হয়েছে। তাছাড়া মামুদ শরীফের মত শাসকের দ্বারা জনজীবন কম বিপর্যস্ত হয় নি। মুকুন্দ চক্রবর্তীর মত মনসামঙ্গলের কবি ক্ষেমানন্দ শাসকের দ্বারা বিপর্যস্ত হন। রামকৃষ্ণ রায় বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাণত্যাগ করেন। ভারতচন্দ্র স্বয়ং বর্ধমানরাজ ও কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিপর্যস্ত হয়েছেন। ভারতচন্দ্রের 'নাগাষ্টকম্' কাব্যটি তো তৎকালীন সামন্ত শাসক রামদেব নাগের অত্যাচারের বিবরণ। শাসকের যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা সাধারণ মানুষ এতটাই বিপর্যস্ত হয়েছিল যে সাধারণ মানুষ ধনীর শোভাযাত্রার শব্দ পেলেও ভয়ে বাসস্থান পরিত্যাগ করে পলায়ন করত। মনসামঙ্গল থেকে ধর্মমঙ্গল পর্যন্ত এর প্রচুর বিবরণ পাওয়া যায়। রাঢ় বাংলা তুর্কী আক্রমণ থেকে বর্গীর হাঙ্গামা পর্যন্ত এতবার বিপর্যস্ত হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী শুনতে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছিল - এ কারণেই ধর্মমঙ্গলের কাহিনী সর্বাপেক্ষা যুদ্ধ বিগ্রহে ভরপুর। সাধারণ জনসমাজ এক সময় বর্ণ হিন্দুর পীড়নে মুসলমান আক্রমণকারীদের পরিত্রাতার ভূমিকায় দেখেছিল। অষ্টাদশ

শতাব্দীতে এসে তারাই আবার পরিত্রাতার ভূমিকায় মারাঠা বর্গীদের দেখেছিল।

সমসাময়িক রাষ্ট্রনীতির প্রভাব মঙ্গলকাব্যগুলির কাহিনী ধর্ম রূপায়ণে সাহায্য করেছিল। মনসামঙ্গলে এই প্রভাব কম, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ চাঁদ সদাগরকে অত্যাচারী জমিদার রূপে চিত্রিত করেছেন। শাসকের দ্বারা পীড়িত হয়েই মুকুন্দ চক্রবর্তী কালকেতুর আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেছেন। যেখানে প্রজারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে, তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে পারবে। ভাঁড়ুদত্তের উক্তিতে তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। অবশ্য অনেকে মনে করেন মুকুন্দ চক্রবর্তী মোগল সম্রাট আকবরের আদর্শে কালকেতু চরিত্রটি গড়ে তুলেছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রনীতির প্রভাব আছে। যেমন, শাসকগণ অনেক সময়ই কর্মচারীদের দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন আর তাঁর অগোচরেই রাজকর্মচারীদের দ্বারা প্রজারা শোষিত হত। ধর্মমঙ্গলের গৌড়েশ্বরের অগোচরেই মহামদ প্রজার উপর অত্যাচার করত। বিবাহ সম্পর্ক দ্বারা প্রতিবেশী রাজ্যকে সামন্ত শাসকে পরিণত করা মধ্যযুগের রাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য। সম্রাট আকবর এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন। একইভাবে গৌড়েশ্বর লাউসেনকে দিয়ে প্রতিবেশী রাজ্য জয় করিয়ে করদ সামন্ত রাজ্যে পরিণত করেছে। আবার এই সামন্ত শাসকগণ সুবিধা পেলেই স্বাধীনতা ঘোষণা করত। ইছাই ঘোষ ক্ষমতাশীল হয়ে গৌড়েশ্বরকে কর দিতে অস্বীকার করে, এমনকি ত্রিষষ্ঠী নাম পরিবর্তন করে তার রাজধানীর নাম করে ঢেকুরগড়। কেন্দ্রীয় শাসক কখনো কখনো বিদ্রোহী সামন্ত শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে তাকে দমন করত। এই সময়ে কেন্দ্রীয় শাসকের দুর্বলতার সুযোগে ছোট বড় জমিদাররা রাজা নাম গ্রহণ করে প্রচুর ক্ষমতা ভোগ করত। কৃষ্ণচন্দ্র এমনি একজন জমিদার ছিলেন। তাদের ভোগ বিলাসীতার অর্থ যোগাতে জনসাধারণ বিপর্যস্ত হত। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে এ সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এইভাবে দেখা যায় পরিবর্তিত রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সমাজ জীবনেও নানা পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাহ্যিক রাজনীতির প্রভাব না থাকলেও আভ্যন্তরীণ রাজনীতি বিশেষভাবে দেখা যায় অর্থাৎ দেবদেবী চরিত্র ও অন্যান্য চরিত্রের রাজনৈতিক কূটকৌশল প্রয়োগ দেখা যায়। গ্রাম্য কবিদের প্রত্যক্ষ শাসন নীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকলেও স্থানীয় জমিদার বা সামন্ত শাসককে তাঁরা দেখেছিলেন, রাজনৈতিক কূটকৌশল প্রয়োগে তারা দক্ষ হত। বাংলাদেশের ইতিহাসের একটা দীর্ঘ অরাজকতার পর মনসামঙ্গল কাব্যগুলি লিখিত হয়েছিল। তাই মনসামঙ্গলের কাহিনীতে স্থির কূটকৌশলের প্রয়োগ দেখা যায় না। এখানে মনসা মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী সামন্ততান্ত্রিক শাসকের প্রতিভূ। প্রতিপত্তি বিস্তার করতে গিয়ে তাই সে হীনতা ও নীচতার পরিচয় দিতে ভোলেনি। চাঁদ সদাগরের প্রতি সে ব্যক্তিগত ক্রোধের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে মাত্র — কোন রকম ন্যায়-নৈতিকতার পরিচয় দেয় নি। মধ্যযুগীয় সুলতানগণ যেমন শাসন ক্ষমতা ও ধর্ম বিস্তার করতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে ধন-সম্পদ দিয়ে বশীভূত করেছে। মঙ্গলকাব্যের দেবীরাও প্রথম থেকে তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকে অর্থ সম্পদ দিয়ে স্বপক্ষে নিয়ে এসেছিল। সাধারণ মানুষ আত্মরক্ষার তাগিদে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাবানকে আশ্রয় করত। জগজ্জীবনের কাব্যে চাঁদের উক্তিতে এই সত্য প্রকাশিত। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে মানুষের জীবনে শাসকের প্রভাব ছিল অনেক বেশী স্পষ্ট। বিশেষত মোগল সুশাসনের প্রভাব পড়েছিল জনজীবনের উপর এবং চৈতন্যের ধর্মের প্রভাবে মানুষ অনেকখানি আপোষপন্থী হয়ে পড়েছিল। তাই চাঁদের পূজা আদায় করতে গিয়ে মনসা প্রথমেই পিরীতের পূজা আদায়ের কথা ভেবেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে মনসাকে যতটা ক্রুর হতে দেখা যায় পরবর্তীকালে রচিত মনসামঙ্গলের মনসা চরিত্রে ততটা ক্রুরতা দেখা যায় নি। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতে চণ্ডীকে পূজা প্রচার করতে গিয়ে কিন্তু ততটা ক্রুর হতে দেখা যায় না। কেননা যে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে মনসাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়েছিল চণ্ডীমঙ্গলে তারা অনেক বেশী নমনীয় ও আপোষপন্থী। চণ্ডী পূজা প্রচার করতে গিয়ে কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শাসকগণের মত উদারতার পরিচয় দিয়েছে। বিশেষত ব্যাধ কালকেতুর

গুজরাট নগর স্থাপন একথা প্রমাণ করে। পশুসমাজ, কালকেতু এবং কলিঙ্গরাজ প্রত্যেকেই দেবীর ভক্ত। কিন্তু কলিঙ্গরাজ অরণ্যে দেবীর দেউল প্রতিষ্ঠা করে নামমাত্র পূজার দ্বারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করত। কিন্তু চণ্ডী নিত্যপূজা অর্থাৎ কলিঙ্গরাজকে আরো নত দেখতে চায়। তাই কলিঙ্গরাজ্যের অভ্যন্তরেই দেবী গুজরাট নগর প্রতিষ্ঠা করে কালকেতুকে প্রতিষ্ঠা করল। আবার অন্যদিকে পশুগণ ও কালকেতু উভয়েই দেবীর ভক্ত হওয়ায় দেবী কারোই ক্ষতি করতে পারে না। তাই গুজরাট নগর স্থাপন করে কালকেতুর আক্রমণ থেকে পশুদের রক্ষা করল এবং পশুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সিংহকে পশুরাজ নিযুক্ত করল। আবার কালকেতুকেও ধন-ঐশ্বর্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা দিয়ে অন্ত্যজ ব্যাধ জীবন থেকে মুক্তি ছিল। দেবী সচেতন ভাবেই কালকেতু ও কলিঙ্গরাজের দ্বন্দ্বের সূচনা করে কলিঙ্গরাজকে দমন করল। এখানে দেবী বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের মত কাজ করেছে।

চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর গুজরাট নগর প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সম্রাট আকবরের মত সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা দেখা যায়। মধ্যযুগে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও শাসকের অত্যাচারে প্রজাদের দেশত্যাগ সাধারণ ঘটনা। কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী স্বয়ং দামুন্যা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বুলান মণ্ডলের নেতৃত্বে কলিঙ্গ রাজ্যের বিপর্যস্ত প্রজারা গুজরাট নগরে আশ্রয় লাভ করে এবং জীবনজীবিকার নিরাপত্তা লাভ করে। বস্তুত কালকেতুর মত প্রজাহিতৈষী জমিদারের অভাব সেকালে ছিল না। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতেও সমসাময়িক রাষ্ট্রনীতির প্রভাব দেখা যায়, লাউসেনের রাজ্য জয় ও বিবাহনীতির দ্বারা প্রতিবেশী রাজ্যকে সামন্ত রাজ্যে পরিণত করা, কালু ডোমের মত ডোমদের প্রতিষ্ঠা দিয়ে অন্ত্যজ জীবন থেকে মুক্তি দান করা ইত্যাদি। গৌড়েশ্বর ও মহামদের ব্যবহারে অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক প্রভাব দেখা যায়। ধর্মদেবও গৌড়েশ্বরের মত শাসনক্ষমতাহীন চরিত্র, সে হনুমানকে দিয়েই কার্যোদ্ধার করেছে। অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র কিন্তু দেবী অন্নপূর্ণাকে রাজনীতিবিদের মত অঙ্কণ করেননি। বরঞ্চ বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ইতিহাসের ছবি এঁকেছেন তিনি। মানসিংহ পালায় ভবানন্দ মজুমদারের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের বাক্‌বিতণ্ডা কাল্পনিক কাহিনীর উপর দাঁড়িয়ে।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের পরিচয় বিশেষত লভ্য নয়, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলে কোথাও তা দেখা যায় নি। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে কিছুটা দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ঘনরাম চক্রবর্তী রাজার, প্রজার ও দেশের মঙ্গল কামনা করেছেন। কালু ডোমের দেশত্যাগ করতে পীড়া বোধ হওয়া, নিজের জাতি-বৃত্তি ত্যাগ করতে অস্বীকার করার মধ্যে স্বাজাত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বদেশ প্রেম বিষয়টি ইউরোপীয় শিক্ষা -সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার পরই বাঙালীরা লাভ করতে পেরেছে। মধ্যযুগের মধ্য পর্বে ইউরোপীয় বণিকদের সংস্পর্শে এলেও তাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি বাঙালীরা আগ্রহ দেখায় নি। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজদের শাসনক্ষমতা বিস্তারের পরই বাঙালীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইংরেজদের দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করেছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে এসেই বাঙালী সমাজে স্বদেশ চেতনা ও স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত হয়েছে বলে দাবী করা যায় ,যদিও জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চাইতে বড় এই ধারণা ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল। তাছাড়াও তৎকালে প্রজাদের দেশত্যাগ করতে হলে শাসকের অনুমতি গ্রহণ করতে হত। তাই কালু ডোম লাউসেনের সঙ্গে ময়না যেতে গৌড়েশ্বরের অনুমতি নেবার কথা ভেবেছে। কিন্তু কিছুটা স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশ চেতনা না থাকলে তাদের পক্ষে এধরণের ভাবনা চিন্তা সম্ভব হত না বলেই বোধহয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের সেনাপতি মীরমদন ও মোহনলালের আত্মত্যাগের কথা প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায়। সুতরাং মধ্যযুগের শেষ পর্বে এই বোধ রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বড় ধরণের বিবর্তনকে চিহ্নিত করেছে বলেই মনে করি। কেননা গোটা মধ্যযুগে যেখানে আদর্শহীনতা, অমানবিকতা শাসকগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে সেখানে এই ধরণের আদর্শবাদ অভিনব ঘটনা।

৫) **অর্থনৈতিক বিবর্তন** ঃ অর্থনৈতিক বিবর্তন বলতে বোঝায় জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবর্তন। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল মধ্যযুগের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বহুল বিবরণ পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যগুলিতে, পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে তার যথাসম্ভব বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। মধ্যযুগে শিল্প ও বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার হলেও বাংলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি ও কৃষক। গৌতম ভদ্র বলেছেন – "মুঘল অর্থনীতির মূলভিত্তি ছিল কৃষি। কারণ কৃষিই ছিল জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপজীবিকা এবং উদ্বৃত্ত সামাজিক শ্রমের বিপুল সম্পদ কৃষি থেকে সংগৃহীত হত। শোষক ও শোষিতের সম্পর্কের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল কৃষি।"[৬৪] মোগল যুগে কৃষি ব্যবস্থায় সম্রাটের মালিকানা থাকলেও জমি চাষের জন্য কৃষকের অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হত। এ সম্পর্কে ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কিত 'আইন'-এ বলা হয়েছে— 'রাইয়তি কশ্‌থ' জমিকে 'মদৎ-ই-মায়েশ' বা নিষ্কর জমি উপভোগকারীর দল কখনোই 'খুদ কশথ' জমিতে রূপান্তরিত করতে পারবে না । এ সম্পর্কে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের একটি ফরমানে বলা হয়েছে - যদি কৃষক কৃষির যন্ত্রপাতি কিনতে অক্ষম হয়, অথবা জমি ছেড়ে পালিয়ে যায়, তবে আরেক জন কৃষককে জমি দিয়ে দেওয়া হবে, আবার ভূতপূর্ব কৃষকরা জমি চাষ করতে সমর্থ হলে তাকে জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে।[৬৫] এসমস্ত তথ্য থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে কৃষকের জমি ভোগ-দখল করার অধিকার মোগল সম্রাটরা মেনে নিয়েছিলেন। এবিষয়ে নিষ্কর জমি উপভোক্তারা কৃষকের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারত না। অপরদিকে ভূমির মূল স্বত্বভোগী ছিল জমিদার, জায়গীরদার ও সামন্তরাজরা, ফলে জমি ছেড়ে চলে যাবার অধিকার বা বিক্রি করার অধিকার চাষীর ছিল না। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে দেখা যায় লাউসেন তার সঙ্গে কালু ও তার পরিবারকে ময়না নিয়ে যেতে চাইলে শাসক গৌড়েশ্বরের অনুমতি নিতে হয়েছে।

মোগল যুগে কৃষির উন্নতিকল্পে যেমন রাষ্ট্র উৎসাহী ছিল তেমনি কৃষিক্ষেত্র সম্প্রসারণে রাষ্ট্রের কোন বাধা ছিল না। তাছাড়াও দেশে প্রচুর অনাবাদী জমি থাকায় ভূমি রাজস্ব লাভের কারণেও বনজঙ্গল কেটে আবাদি জমি সম্প্রসারণ ও জমিদারি স্থাপন করার অধিকার দেওয়া হত। এরকম জমিদারদের 'বনকাটি' জমিদার বলা হত। বাংলা সাহিত্যে এরকম প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। আবার ভূমি রাজস্ব লাভের আশায় সামন্তরাজ বা জমিদাররা নিজ জমিদারীতে প্রজাদের সুবিধা ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করত। কালকেতুর গুজরাট নগর পত্তন অংশে এরকম বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে বুলান মণ্ডলের নেতৃত্বে চাষীরা এসে বসতি স্থাপন করে, এবং ক্রমশ নানা জাতি ও ধর্মের লোক এখানে বসতি স্থাপন করতে থাকে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে এ শ্রেণীর জমিদার ও সামন্তরাজ ছাড়া আর এক রকমের চাষীর অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে। এরা ছিল অর্থ-সম্পদে সমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্যে এরকম সম্পন্ন চাষীদের বলা হত মোড়ল বা মণ্ডল। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে আছে -

"জগাই নামে মণ্ডল নগরেত ঘর।
ধনের অন্ত নাহি রাজার সমোসর॥" (বিজয়/২৯৪)

মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যেও এরকম গ্রামীণ মোড়লের সমৃদ্ধির চিত্র পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গগীতিকার মলুয়া পালায় মলুয়া তার পিতার পরিচয় দিতে গিয়ে এরকম সমৃদ্ধির কথা বলেছে।

এসমস্ত সম্পন্ন চাষীদের বলা হত 'খুদ-কশথ'।[৬৬] এদের সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগর এরকম গ্রামীণ মোড়লের মজুরি করে অর্থ সংগ্রহ করেছিল।এসমস্ত 'খুদ-কশথ' চাষীরা সম্পদশালী হওয়ায় মজুরকে সামান্য মজুরি দিয়ে অথবা অন্নের বিনিময়ে বেগার শ্রমিক দিয়ে জমি চাষ করাত। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নে এরকম মজুরদের কথা পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যে সেকালের সাধারণ চাষীর অবস্থা, চাষ পদ্ধতি ও শ্রমদানের কথা পাওয়া যায়। জমিদার ও মহাজনরা চাষীদের জমি, বীজধান ও চাষের উপকরণ দিয়ে চাষের সহায়তা করত। চাষীরা সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায় ফসল ফলাত এবং এসময়ে চাষীদের দুর্দশার অন্ত থাকত না, কিন্তু ফসল ফলাবার পর তাতে জমিদার-মহাজনের থাবা প্রসারিত হত।

সাময়িক সুবিধালাভের লোভে কোন জমিদারের এলাকায় বসতি স্থাপন করলে আর ঐ জমিদারের এলাকার বাইরে যাওয়ার সুযোগ থাকত না। সামন্তরাজ বা জমিদারকে কোন না কোন ভাবে কখনো না কখনো রাজস্ব শোধ করতেই হত, ফলে চাষী বা প্রজা জমিদার থেকে শুরু করে ইজারাদার, পেশকার, ডিহিদারের দ্বারা ক্রমাগত শোষিত হত। অত্যাচারিত প্রজাগণ নিষ্কৃতি লাভের জন্য পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারত না, কেননা কর আদায়কারীরা সর্বদাই পেয়াদা বসিয়ে পাহারা দিত। ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর আত্মবিবরণীতে এই বিবরণ পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি রামদাস আদকের কাব্যে রাজস্ব পরিশোধ করতে না পারায় স্থানীয় শাসক চৈতন্য সামন্তের অত্যাচারের কথা পাওয়া যায়। কবিও গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। একই ঘটনার সাক্ষ্য মেলে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় না থাকলেও রাজকর্মচারীদের অত্যাচারে প্রজার দুর্দশার অন্ত থাকত না। স্থানীয় শাসক সামন্ত বা জমিদারগণ মোগল রাজদরবারের অনুকরণে আড়ম্বর ও বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে গিয়ে প্রজাদের কর ভারে জর্জরিত করেছে, আবার কখনো রাজকর্মচারীরা কেন্দ্রীয় শাসকের দোহাই দিয়ে অতিরিক্ত কর আদায় করত। রাজকর্মচারীদের অত্যাচার অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত হয়ে উঠত। তাই অষ্টাদশ শতকে রচিত গোপীচন্দ্রের গানে প্রজাদের সমৃদ্ধির চিত্র থাকলেও অল্পকালের মধ্যে কর ভারে জর্জরিত প্রজার দুর্দশার চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। এখানে প্রজাদের লাঙল, গরু এমন কি স্ত্রী-পুত্র বিক্রি করে রাজস্ব পরিশোধের চিত্র পাওয়া যায় —

"চাষা লোকে দেয় খাজনা হাল গরু বেচেয়া ॥
সাউধ সদাগর দেয় খাজনা নাও নৌকা বেচেয়া ॥
ফকির দরবেশ দেয় খাজনা ঝোলা কেথা বেচেয়া ॥
লাঙ্গল বেচায় জোয়াল বেচায় আরো বেচায় ফাল।
খাজনার তাপত বেচায় দুধের ছাওয়াল ॥
দুধের পুত্র বেচেয়া হাকিমের মালগুজার জোগাইল।
পুত্র শোকে রাইয়ত প্রজা কান্দিতে লাগিল ॥" (গোপীচন্দ্রের গান/২)

এরকম অমানবিক শোষণের ফলে প্রজা সাধারণ কপর্দকশূন্য হয়ে পড়ে। মুকুন্দ চক্রবর্তীর বিবরণে পাওয়া যায় সেকালে শাসকের রাজস্ব আদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতির কথা, যেমন— সেলামী, বাঁশগাড়ী, পার্বণি, পঞ্চক, জাতগুড়া, ধানকাটি ইত্যাদি। গৌতম ভদ্র জানিয়েছেন – "এইসব 'আবওয়াব' কৃষকদের কাছে রাজস্বের বোঝাকে অসহ্য করে তুলেছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। একথা বলা হয় যে, মুগলযুগের শেষে কৃষকদের উপর রাষ্ট্রের দাবিও বৃদ্ধি পেয়েছিল।"[৯৭] বাংলাদেশে টোড়মল প্রবর্তিত নতুন ভূমিরাজস্বনীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। এই রীতির উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব বৃদ্ধি করা। প্রথম দিকে জমি জরিপ ও উৎপাদিত শস্যের উপর কর আদায়ের চাইতে লাঙল পিছু কর আদায় করা হত।কিন্তু মোগল শাসনের প্রভাবে উৎপাদিত শস্য, জমি জরিপ ও মাপজোখেরভিত্তিতে রাজস্ব আদায় করা হতে লাগল।এই রাজস্ব আদায়ের জন্য নতুন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়, ফলে প্রজার উপর অতিরিক্ত কর ভার আরোপিত হয়। তাছাড়া কর্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণতা প্রজাদের আরও জর্জরিত করে। বলাই বাহুল্য কৃষক সমাজের প্রতিনিধি কবিরা এই নতুন ব্যবস্থাকে ভাল বলে মেনে নিতে পারেননি, তাই এই নতুন ব্যবস্থাকে শাসকের অত্যাচার বলে মনে হয়েছে। আমরা ভাঁড়ু দত্তের মুখে এই নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা পাই এছাড়াও আছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। খরা ও বন্যার ফলে বাংলার মানুষের দুর্দশার এক শেষ হত। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে এরকম বন্যায় মানুষের দুর্দশার চিত্র পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সর্বস্বান্ত মানুষ মহাজনের দ্বারস্থ হত. একবার মহাজনের কবলে পড়লে আর কোন দিন সে নিস্তার পেত না। বাঙালী সমাজে তাই কিরাত পাড়া থেকে অভিজাত পাড়া সর্বত্রই অভাবের করাল গ্রাস ছিল। মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই

দারিদ্র্যের করুণ চিত্র সর্বত্রই পাওয়া যায়। অন্যদিকে সমাজে অর্থ কৌলীন্য স্বীকৃত হওয়ায় অর্থহীন মানুষের করুণ অভিব্যক্তি সূচিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাসকের কু-শাসন, দস্যুদের অত্যাচার এবং মারাঠা বর্গীদের আক্রমণে জনজীবন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। চারিদিকে অন্নাভাব প্রকটিত হয়েছিল। সাধারণ মানুষের একমাত্র আকুতি ছিল কায়ক্লেশে বেঁচে থাকা। লক্ষণীয়, দরিদ্র তো বটেই অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ধনীরাও এই পর্বে অর্থ ও বিত্ত হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। তাইতো ভারতচন্দ্রের অন্নপূর্ণার ঘরেও প্রবল অন্নাভাব দেখা যায়। গোপীচন্দ্রের গানেও এই চিত্র পাওয়া যায়। গোপীচন্দ্রের গানে এক রায়ত বলেছে—

"ছোট রাইয়ত উঠি বলে, 'বড় রাইয়ত ভাই।
ধন-কাঙ্গালী হৈল রাজা রাজ্যের ভিতর।
কেমন করি বঞ্চিব রাইয়ত সকল'।" (গোপীচন্দ্রের গান/৩)

লোকে বাধ্য হয়ে ঋণ পরিশোধ এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য বংশানুক্রমে আত্মবিক্রয় করত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে মাত্র চোদ্দ টাকায় পুরুষানুক্রমে আত্মবিক্রয়ের চিত্র পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৯০ খ্রীঃ) ধর্মমঙ্গলের কবি রামকান্ত রায়ের আত্মবিবরণীতে সে সময়কার বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। কৃষি ও গৃহকর্ম ছিল সে সময়কার স্বাভাবিক জীবিকা অর্জনের উপায়, কিন্তু চাষী গৃহস্থ ঘরের ছেলেরাও কর্মহীন বেকার হয়ে পড়েছিল। বস্তুতঃ এই বেকারত্বের চিত্র মধ্যযুগের সাহিত্যে পাওয়া যায় না। রামকান্ত রায়ের বর্ণনা অনুসারে —

"মাস ছয় বেকারে বসিয়া আছি ঘরে
[গৃহ] স্থিতি কাজ মোর মনে নাই ধরে।"[৬৮]

শিক্ষিত কবি কৃষির প্রতি উৎসাহ বোধ করেননি, তাই তিনি বেকারত্বের জ্বালা অনুভব করেছেন। শহরে গিয়ে দরখাস্ত নিয়ে ঘুরে ঘুরেও কবি চাকুরী জোগাড় করতে পারেননি।

কৃষিজাতদ্রব্যের প্রাচুর্য, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তার ফল ভোগ করত উচ্চবিত্তের মানুষ ও মধ্যম শ্রেণীর মানুষরা। তাদের আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যের বর্ণনা পাওয়া যায় মঙ্গলকাব্যগুলিতে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কবিদের বর্ণনায় বণিক, সামন্তরাজ, মহাজন, জমিদারদের ঐশ্বর্যের চিত্র পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্গী আক্রমণের ফলে সাধারণ জনজীবন স্তব্ধ হয়ে গেলেও এক শ্রেণীর মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। ভারতচন্দ্র স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় থেকে দারিদ্র্যের যন্ত্রনা ভোগ করেননি। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভাকে কেন্দ্র করে যে শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল তাদের সমৃদ্ধি ছিল। তৎকালীন দ্রব্যমূল্য কম থাকায় জনজীবনে দুঃখ-দুর্দশার মধ্যেও সুখ ও ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

মোগল আমলের পূর্ব থেকেই বাঙালী বণিকরা অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়েছিল। সুলতানী আমলের শেষের দিকে মোগল-পাঠান দ্বন্দ্বে রাষ্ট্রীয় অরাজকতার ফলে জলপথে পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণ অপ্রতিহত হয়ে ওঠে। তৎকালীন শাসকের পক্ষে এই অত্যাচার দমন করা সম্ভব ছিল না। তৎকালীন গৌড়েশ্বর শেরশাহের আক্রমণের ভয়ে পর্তুগীজদের সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন, এবং বিনিময়ে বাংলার দু'টি বাণিজ্য বন্দর সাতগাঁ এবং চাটগাঁয়ে তাদের বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন।[৬৯] এর ফলে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং বহির্বাণিজ্যে পর্তুগীজ বণিকরা একাধিপত্য লাভ করে। তার সুফল অবশ্য বাংলার বণিকরাও খানিকটা পেয়েছিল। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে সপ্তগ্রামের বণিকদের ঘরে বসেই প্রচুর ধন অর্জনের চিত্র পাওয়া যায়। যাই হোক, এভাবেই ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষতঃ ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাঙালী বণিকদের বাণিজ্যযাত্রার অবসান ঘটে। তৎপরিবর্তে রাজকীয় উদ্যোগে বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাণিজ্যযাত্রার পরিবর্তে চণ্ডীমঙ্গলে রাজকীয় উদ্যোগে ধনপতি ও শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রার চিত্র

পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' কাব্যে বৈদেশিক বণিকদের বাণিজ্যের চিত্র পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রপ্তানি বাণিজ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাধান্য গড়ে ওঠে। বিদেশী বণিকরা বাংলার সস্তা জিনিসপত্র অল্প পয়সায় কিনে নিতে শুরু করে। ভারতচন্দ্রের কাব্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশে আগত দেশী-বিদেশী বণিকদের কথা পাওয়া যায়। এভাবে দেশীয় বণিকদের বাণিজ্যের প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যায়। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সেকালের দেশীয় বণিকদের বাণিজ্য বিনিময়ের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে কৃষিজ ও কুটীরশিল্পজাত দ্রব্য বিনিময়ে ধাতব দ্রব্য আমদানির চিত্র পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যের বর্ণনায় কাল্পনিকতা থাকলেও যে সমস্ত দ্রব্যের তালিকা পাওয়া যায় তাতে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে। বিদেশী বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে এদেশীয় বণিকরা অন্তর্বাণিজ্যের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিল। সামুদ্রিক বাণিজ্য বা অন্যান্য স্তরের বণিকদের সঙ্গে সরাসরি উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পর্ক ছিল না। অন্তর্বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ভূস্বামীরা নিজেদের অঞ্চলে ছোট ছোট হাট বা বাজার বসিয়ে বাণিজ্যে সহায়তা করত। এই স্থানিক বাণিজ্য ও বণিকরা স্থানীয় কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। স্থানীয় ভূস্বামীরা বণিকদের নিকট থেকে তোলা আদায় করত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতুর গুজরাট নগরে হাট বসানো এবং ভাঁড়ু দত্তের তোলা আদায়ের চিত্র পাওয়া যায়। তোলা আদায়কে কেন্দ্র করে স্থানীয় বণিকদের সঙ্গে সংঘর্ষের চিত্রও পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সিরাজদ্দৌলার পতনের পূর্বে অসংখ্য বিদেশী জাতি বাংলার বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসীরাই প্রধান ছিল। পরবর্তীকালে দেশীয় বাণিজ্যে ইংরেজ বণিকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে এদের গুরুত্ব খুব কম ছিল না। তাছাড়া পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের অত্যাচার ও বর্গী আক্রমণের ফলে এ দেশীয় বাণিজ্য প্রায় নষ্ট হয়ে যায়। অর্থনৈতিক বন্টন বৈষম্যের ফলে সাধারণ এক শ্রেণীর মানুষের জীবন অর্থ-সম্পদে ভরপুর হয়ে ওঠে, আর এক শ্রেণীর মানুষের জীবন শোষণ ও বঞ্চনায় জর্জরিত হয়ে পড়ে; যদিও সাধারণ বাঙালী সমাজে বাণিজ্যবৃত্তি খুব একটা গ্রহণীয় ছিল না। 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস' একথা জানা সত্ত্বেও মূলধনের অভাবে ও প্রবঞ্চনার পেশাকে সাধারণ মানুষ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিল না। কৃষিজ উৎপাদন ব্যবস্থায় অন্নের চাহিদা মিটলেও কাঁচা পয়সার অভাবে বাণিজ্যবৃত্তি গ্রহণ করতে মানুষ বাধ্য হয়েছিল। ফলে ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেখা যায় গৌরী শিবঠাকুরকে বাণিজ্যের পরামর্শ দিয়েছে।

মোগল আমলে কৃষির পরেই অর্থনীতিতে শিল্পের স্থান ছিল। তবে সেকালে বৃহৎশিল্প ছিল না, ক্ষুদ্রশিল্পই প্রধান ছিল, তার মধ্যে অন্যতম তাঁত শিল্প। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের ফলে বহির্বাণিজ্যে বাংলার তাঁতজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে অবশ্য বাংলার তাঁত শিল্পীরা খানিকটা সুফল ভোগ করতে থাকে। গ্রাম ছেড়ে তারা শহরমুখী হয়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বাজারে বাংলার বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সেকালের বস্ত্রশিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় আছে। বাংলার সাধারণ ঘরের মানুষরা বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করত। কুলীন-অকুলীন পরিবারের মেয়েরাও সুতা কেটে জীবিকা নির্বাহ করত। বস্ত্র ছাড়া পাট, তুলা ও রেশম থেকে নানা ধরনের ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদিত হত। মঙ্গলকাব্যগুলিতে তার প্রচুর বিবরণ পাওয়া যায়। এছাড়া লবণ, চিনি, লোহা, সীসা, মৃৎশিল্প, শঙ্খশিল্প, বাঁশ, বেত ও কাঠের তৈরী শিল্পজাতদ্রব্য বাংলার কুটীরশিল্পে তৈরী হত। মধ্যযুগে বর্ণ ও বৃত্তি ব্যবস্থায় জাতিগত বৃত্তি পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে কিন্তু বৃত্তি পরিবর্তনের কথা পাওয়া যায়। একই ব্যক্তি বিভিন্ন বৃত্তিতে থেকে জীবিকা নির্বাহ করত। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে মানুষকে এই পরিবর্তন স্বীকার করে নিতে হয়েছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনে চাকুরীবৃত্তিধারী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। মধ্যযুগে এক শ্রেণীর মানুষ রাজকার্যে নিযুক্ত থাকলেও চাকুরীবৃত্তি বা রাজসেবা সমাজে স্বীকৃত ছিল না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে রচিত শিবায়ন কাব্যে দেখা যায় ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিনিধি শিবঠাকুরকে গৌরী চাকুরীবৃত্তি গ্রহণের পরামর্শ দেয়নি। কিন্তু কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য নষ্ট হয়ে যাবার ফলে সাধারণ মানুষকে বৃত্তিমুখী শিক্ষার দ্বারা চাকুরীবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছে। ভারতচন্দ্র স্বয়ং ফারসী ভাষা শিখেছিলেন রাজকার্য লাভের জন্য। এভাবে চাকুরীবৃত্তিধারী মধ্যসত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে নারীগণের পতিনিন্দা অংশে এই মধ্যসত্বভোগী শ্রেণীর পরিচয় আছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে সাধারণ মানুষের চাইতে এরা অনেক বেশী সুবিধাও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যসত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টির মূলে এই শ্রেণীর বৃত্তিজীবীরা ছিল।

মোগল আমলে সুষ্ঠু মুদ্রা ব্যবস্থা চালু থাকলেও ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার ফলে মুদ্রা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্রমুদ্রা প্রচলিত থাকলেও সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বর্ণমুদ্রা বা মোহর সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। মুদ্রা ব্যবস্থার নিম্নতম মান হিসাবে কড়ির ব্যবহার মধ্যযুগের প্রথম থেকে প্রচলিত থাকলেও শেষ পর্বে কড়ির মূল্যমানে হেরফের ঘটে যায়। ভারতচন্দ্রে কাব্যে, কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কড়ির মূল্যমান ওঠানামা করায় দৈনন্দিন জীবনে ক্রয়-বিক্রয়ে অসুবিধা হত। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে খাঁটি মুদ্রার পরিবর্তে বাজারে মেকী মুদ্রা চালু হয়েছিল। বাজারে পুরাতন ও নতুন উভয় প্রকার মুদ্রা চালু থাকলেও পুরাতন সিক্কাকে নতুন সিক্কায় বদল করে নিতে বাট্টা দিতে হত। তাছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মুদ্রিত বিভিন্ন মানের টাকা বাংলাদেশে প্রচলিত হয়। এসমস্ত মুদ্রাকে বদল করে নিতেও বাট্টা দিতে হত। মধ্যযুগের শেষ পর্বে এটা একটা বড় ধরনের অর্থনৈতিক পরিবর্তন রূপে চিহ্নিত হয়।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে মধ্যযুগীয় বাজার ব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা অত্যন্ত কম। সাধারণ মানুষ খুব অল্প মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করত। দ্বিজ মাধবের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' কাব্যে তেরো গণ্ডা কড়িতে কালকেতুর বিবাহের কেনাকাটা সম্পন্ন হয়েছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায়। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে দুর্বলা দাসীর বেসাতি বর্ণনায় সস্তা বাজার দরের পরিচয় আছে। সমকালীন ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে এ সমস্ত তথ্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। কৃষ্ণরাম দাসের কাব্যে এবং ভারতচন্দ্রের কাব্যে দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির পরিচয় আছে। হীরা মালিনী কিংবা বিমলা মালিনীর বেসাতি অংশে যে দ্রব্যমূল্য তালিকা পাওয়া যায় তা খুব কম হলেও তাকে মহার্ঘ বলা হয়েছে, এখানে মনে রাখা দরকার সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত কম। এক শ্রেণীর মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ভোগের চিত্র থাকলেও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশার শেষ ছিল না। কেননা কৃষিজাতদ্রব্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় তৈজসপত্রের চাহিদা মিটলেও কাঁচা পয়সার অভাবে অন্য প্রয়োজন মেটাতে পারত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য পর্বে এ অবস্থার আরও অবনতি হয়, তাই সাধারণ মানুষ ন্যূনতম জীবিকা গ্রহণ করেছিল। অন্নাভাব ও বস্ত্রের অভাবে গাছের পাতা পরিধান করে লজ্জা নিবারণ করতে হয়েছে এরকম চিত্রও সাহিত্যে পাওয়া যায়। তাই মানুষের কামনা ছিল শুধুমাত্র খেয়ে পরে বেঁচে থাকা। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরবর্তীকালেও জনগণের অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি। অর্থাভাব, কর্মহীনতায় জনজীবন স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল।

৬) ধর্মনৈতিক বিবর্তন : নানা ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রে বিভক্ত বাঙালীর ধর্মগত পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা খুবই কঠিন কাজ এবং ধর্মগত বিবর্তনের চিত্র তুলে ধরা দুঃসাধ্য বিষয়। কেননা বাঙালী সমাজে প্রতিটি ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রে পৃথক পৃথক ধর্মাচার দেখা যায়, সংস্কার-বিশ্বাস ও আচার-আচরণগত ক্ষেত্রে দুস্তর ব্যবধান লেখা যায়। এমন কি আর্থসামাজিক কারণেও একই ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের মানুষের আচার-আচরণগত ব্যবধান ছিল। কিন্তু কালগত বিবর্তনে জাতি. ধর্ম ও বর্ণের পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল, শুধু মাত্র ধর্ম নয়, বাঙালীর দেবভাবনাগত পরিবর্তন বা দেবচরিত্রগত পরিবর্তনও সামাজিক ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন চিহ্নিত করে। প্রাচীন যুগে বাঙালী সমাজের প্রধান ধর্ম ছিল দু'টি- কৌলধর্ম ও বৈদিক-পৌরাণিক ধর্ম। মধ্যযুগে সমাজের প্রধান ধর্ম হয় তিনটি— বৌদ্ধ,

বৈদিক-পৌরাণিক ও ইসলামধর্ম। মধ্যযুগীয় বাঙালীর হিন্দুধর্ম বস্তুতপক্ষে বৈদিক-পৌরাণিক ধর্মেরই বিবর্তিত রূপ। প্রাচীনকালের বাংলাদেশে অবৈদিক, জৈন, আজীবিক, বৌদ্ধ, বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম কালক্রমে প্রবেশ করেছিল।[৫৯] তবে 'হিন্দু' নামে কোন স্বতন্ত্র ধর্ম ছিল না। তুর্কী বিজয়ের পরবর্তীকালে বিজিত মুসলমানরা ভারতবর্ষে প্রচলিত ধর্মসমূহকে 'হিন্দু' নামে চিহ্নিত করেছিল। ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এ সম্পর্কে বলেছেন— "মুসলমানেরা যখন এদেশে আসিয়া বসবাস করিল তখন 'হিন্দু' এই একটি সাধারণ নামেই তাহারা এখানকার জাতি ধর্ম ও সমাজকে অভিহিত করিল।"[৬০] পাল ও সেন যুগে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক ধর্ম ও আর্যেতর লৌকিক ধর্মের নানা মিশ্রণ ঘটে চলেছিল এবং শেষ পর্যন্ত সমাজের উচ্চতর শ্রেণীতে বৈদিক-পৌরাণিক ধর্ম এবং নিম্নকোটিতে অনার্য প্রভাবিত লৌকিক ধর্মের চর্চা হতে থাকে। অনার্য প্রভাবিত লৌকিক ধর্মের লৌকিক দেবতারা উচ্চতর সমাজে স্থান লাভ করতে পারেনি, তাই তারা এতদিন অন্তরালবর্তী হয়ে ছিল, কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণ ও ইসলামধর্মের প্রসারের ফলে হিন্দুধর্মের ভিত্তি নড়ে উঠেছিল, এসময় লৌকিক দেবতারা আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পেল এবং অনেকক্ষেত্রেই পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে নানা সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে এক ও অভিন্ন রূপে প্রতিপন্ন হতে থাকল। তুর্কী বিজয়ের অব্যবহিত পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম নানা বিপর্যের সম্মুখীন হয়েছিল। ইসলামের আগ্রাসন থেকে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করার প্রয়োজনে রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদী হিন্দুরা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন-বিবর্তনের অনিবার্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য সাহিত্যগুলিতে এই পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হিন্দুধর্মের চেহারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মধ্যযুগের শুরুতেই বাঙালী হিন্দুর ধর্মীয় জীবনে যে চরম অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় সেকালের সাহিত্যে। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সেকালের এই অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। সাধারণ মানুষ পৌরাণিক ধর্মাচার থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল, শাক্ত-তান্ত্রিকতা, মদ্যপান, ব্যাভিচার ধর্মাচারের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। লোকজীবনে নানা লৌকিক-অপৌরাণিক দেবদেবী— মনসা, চণ্ডী, ষষ্ঠী, বাশুলী, ধর্মঠাকুরের প্রভাব সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বৈষ্ণবধর্ম তখন পর্যন্ত জনমানসে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আর্যেতর এসমস্ত দেবদেবীকে নিয়ে পুরাণ সাহিত্যের আদলে এক শ্রেণীর নতুন সাহিত্যধারা গড়ে উঠল, যার মূল বিষয়বস্তুই হল লৌকিক দেবদেবীর পূজা প্রচারের প্রচেষ্টা। এই নতুন সাহিত্য শাখাই 'মঙ্গল সাহিত্য' বা 'মঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিত হল। বৌদ্ধধর্ম ও তার সংস্কারের মধ্যে থেকেই বাঙালী জাতির জন্ম, কিন্তু খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দী থেকেই বৌদ্ধধর্মের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সমাপ্ত হতে থাকে, কেননা বৌদ্ধধর্ম তান্ত্রিকতাবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হতে থাকে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যেও তান্ত্রিকতা ছিল, ফলে উভয় ধর্মাচারের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ তন্ত্র মতের চামুণ্ডা, বাশুলী, ষষ্ঠীর মত দেবীরা হিন্দুধর্মে স্থান করে নেয়। কারো কারো মতে হিন্দুর কালী ও ভদ্রকালী বৌদ্ধ তন্ত্রেরই দেবী।[৬১] কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। পাল ও সেন যুগে এসে নানা আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যে পড়ে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মে আর বিশেষ পার্থক্য রইল না। বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের পথে চলে গেলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপর দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে গেল। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ক্রমশ তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শাক্তধর্মের মধ্যে মিলিয়ে যেতে থাকল।[৬২] চর্যাপদের সহজিয়া সাধকগণের গুহ্য সাধনপন্থায় ও নাথধর্মের মধ্যে অবলুপ্ত প্রায় বৌদ্ধধর্মের ভগ্নাংশ বেঁচে রইল।চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালে শাক্ত-তন্ত্রধর্মের ব্যপকতা দেখা গিয়েছিল। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে শাক্ত-তান্ত্রিকদের সাধনপদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে –

"রাত্রি করি মন্ত্র পঢ়ি পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা' সভার সনে॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য বিবিধ বসন।

খাইয়া তা সভা সঙ্গে বিবিধ রমণ॥
ভিন্ন লোক দেখিলে—না হয় তার সঙ্গ।
এতেক দুয়ার দিয়া করে নানারঙ্গ॥" (বৃন্দাবনদাস/১৪৩)

সেকালে বৈষ্ণব বিরোধী ব্রাহ্মণরা বৈষ্ণবদের শাক্ত-তন্ত্রাচারী বলে নিন্দা করত, বৈষ্ণবদের সাধন পদ্ধতিও তাদের কাছে তাই নিন্দনীয় ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের বিস্তার ঘটলে শাক্তধর্ম ও তান্ত্রিকতায় কিছুটা ভাঁটা পড়ে যায়। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর বৈষ্ণবধর্মেও নানা আচার-বিচারের জীর্ণতা দেখা দেয়, ফলত বৈষ্ণবধর্মেও তান্ত্রিকতা প্রবেশ করে 'রাধাতন্ত্র' সৃষ্টি করে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবধর্মের প্রাবল্য হ্রাস পেলে তন্ত্রচর্চা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তবে এই পর্বে শাক্ত ও বৈষ্ণব বৈরিতা হ্রাস পায়। শাক্ত সাধকদের চিন্তাধারায় বৈষ্ণবের কৃষ্ণ ও শাক্তদের কালী একাকার হয়ে যায়। শাক্ত সাধকরা কালীকে নটবর বেশে বৃন্দাবনে প্রত্যক্ষ করেন। রামপ্রসাদ সেন কালীকে কৃষ্ণ, শিব ও রামের সঙ্গে একাকার করে দেখেন।

বাঙালীর ধর্মীয় চেতনায় যে বড় রকমের বিবর্তন ঘটেছিল মঙ্গলকাব্যগুলিতে তার প্রভাব লক্ষ করা গিয়েছিল। মধ্যযুগের শুরু থেকেই বাঙালীর ধর্মীয় জীবনে লৌকিক দেবদেবীর প্রাধান্যের কারণ সমাজ মানসের গভীরেই প্রোথিত ছিল। তুর্কী আক্রমণে বাঙালী হিন্দুর বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে সমাজের অভ্যন্তরে চলেছিল বিরাট সংমিশ্রণ। এরই ফলে উচ্চবর্গের মানুষের সঙ্গে নিম্নবর্গের মানুষের সংমিশ্রণ ঘটে এবং সমাজ রক্ষার তাগিদ থেকেই উচ্চবর্গের মানুষ ভেদাভেদ ভুলে অনার্য লৌকিক দেবদেবীদের প্রাধান্য স্বীকার করে নিতে থাকে। এইভাবে ব্রতের দেবী শীতলা, ষষ্ঠী, কমলামঙ্গলের ব্যাঘ্রভয় নিবারণকারী দেবী কমলা 'জগজ্জননী', 'শৈলসুতা', 'শঙ্কর গৃহিণী', 'পরমেশ্বরী' রূপে প্রতিষ্ঠা পায়। চৈতন্য-পূর্ব যুগে শৈব-শাক্ত প্রবল দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও অভেদত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগর উগ্র শৈব হলেও শেষ পর্যন্ত বাম হাতে মনসা পূজার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মনসা ভগবতী রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

চৈতন্য-পরবর্তীকালে মনসার উগ্রতা ও চাঁদের রুঢ়তা অনেক কমনীয় হয়েছে। তাই চাঁদ সদাগর দেবীর কাছে অনেক বেশী নতজানু হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্ষেমানন্দের কাব্যে চাঁদ সদাগর মনসার স্তবস্তুতি করতে গিয়ে শুধু ভগবতী নয়— লক্ষ্মী, সীতা. গয়া, গঙ্গা একাকার করে দিয়েছে।কবির ভাষায়—

"তুমি দেবী ভগবতী : অযোনিসম্ভবা সতী : মাহেশ্বরী অনন্তরূপিণী।
ভবানী ভাবিনী সীতা : লক্ষ্মী-স্বরূপিণী মাতা : মহাকাল রাত্রি তপস্বিনী॥
তুমি ভুজঙ্গের মাতা : আকাশ পাতাল যথা : ত্রিভুবনে তোমার গমন।
জগতে তোমার দয়া : তুমি গঙ্গা তুমি গয়া : স্তুতি নাঞি জানে দেবগণ॥" (ক্ষেমানন্দ/২৯২)

কৃষ্ণরাম দাসের শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যেও দুর্গার সঙ্গে শীতলা ও ষষ্ঠীর অভেদত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কমলামঙ্গলে কমলার সঙ্গে বাঘদেবতা দক্ষিণ রায়কে এক করে দেখা হয়েছে। তাই কমলামঙ্গলে বাঘ কর্তৃক বিপন্ন সাধু কমলার স্তবস্তুতি করতে থাকে।

ধর্মঠাকুরের পূজা সমাজের সকল স্তরে প্রচলিত ছিল না। প্রধানত ডোম সম্প্রদায়ের মানুষই ধর্মঠাকুরের ভক্ত; তাছাড়া চাঁড়াল, ধোপা, শুঁড়ি, জেলে প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর মানুষ ধর্মঠাকুরের পূজক। এই ধর্মঠাকুরের উপর হিন্দুর বিভিন্ন দেবদেবীর প্রভাব কল্পিত হয়েছে, আবার কেউ কেউ এর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। যাই হোক, ধর্মঠাকুরের সংস্থাপনে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব, হিন্দু-তান্ত্রিক প্রভাব, অনার্য জাতির দেবভাবনা ও ধর্ম বিশ্বাস মিলেমিশে গেছে।

চণ্ডীমঙ্গলের দু'টি খণ্ডে চণ্ডীপূজার প্রচার সম্পর্কে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন – "এখানে দেখিতেছি নীচ ব্যাধ-জাতির মধ্যে প্রচলিত দেবীর মর্ত্যে পূজাপ্রচারের ইতিহাস। এই ইতিহাস আসলে বাঙলাদেশের একটা

সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস। বাঙলার রাঢ়-অঞ্চল আজিও বহু প্রকারের আদিম-অধিবাসি অধ্যুষিত। এই আদিম অধিবাসিগণের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। সেই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া বাঙলার জাতীয় জীবনের ভিতরে তাহারা যেমন যেমন অবিচ্ছেদ্য অংশ বা উপাদান বলিয়া স্বীকৃত হইতে লাগিল তাহাদের দেব-দেবীগণও তেমনই উচ্চকোটি হিন্দুগণের দেব-সমাজেও স্বীকৃতি লাভ করিতে লাগিলেন। সেই স্বীকৃতিলাভের ভিতর দিয়াই আদিম-অধিবাসিগণের দেব-দেবীগণও পৌরাণিক দেব-দেবীগণের সঙ্গে নানাভাবে মিলিয়া মিশিয়া অভিন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন।'[৭৩] তাছাড়া মধ্যযুগে ধর্মীয় বিবর্তনে রাষ্ট্রের ভূমিকা একটা থাকতই। সাধারণত শাসকের ধর্মই রাষ্ট্রের ধর্ম হিসাবে পরিগণিত হত, তাই চণ্ডীমঙ্গলে অনার্য ব্যাধ প্রতিপত্তি লাভ করলে তার উপাস্য দেবীও প্রচারলাভ করল। তাই স্বাভাবিকভাবেই কালকেতুর গুজরাট নগরে বর্ণহিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যাধ পূজিতা বা 'পশুগণ'পূজিতা দেবী বর্ণহিন্দু সমাজে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। একারণেই মঙ্গলকাব্যগুলিতে মনসার চাঁদ সদাগর কর্তৃক এবং চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি কর্তৃক পূজা লাভে দেবীর এত আকুতি।

মধ্যযুগের মধ্যপর্বে বাঙালী সমাজের মূল ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় বৈষ্ণবধর্ম। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বৈষ্ণবধর্ম হিন্দু বাঙালী সমাজে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যা অন্য কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁর জীবনদর্শন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম জনসমাজকে তুমুলভাবে আলোড়িত করেছিল। বৈষ্ণবগণ নাম সাধনার মধ্যে দিয়ে জাতপাত মুক্ত সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন, মানবতার জয়গান গেয়েছিলেন। প্রাক্‌চৈতন্য যুগেই বৈষ্ণব কবি 'সবার উপর মানুষ সত্য' এই বাণী রচনা করেন। চৈতন্যদেব সমাজের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর ভক্তিমন্ত্রের আঘাতে ভেঙ্গে ফেলতে চাইলেন। তিনি ঘোষণা করলেন— কৃষ্ণভক্ত চণ্ডাল ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের চাইতে শ্রেষ্ঠ। তিনি কৃষ্ণভক্তির দ্বারা জাতপাতহীন ভক্তির রাজ্যে সাম্যের গান রচনা করেন। সেখানে বর্ণ বিরোধিতা, পঙ্‌ক্তি ভোজন ইত্যাদির দ্বারা মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। কোশাম্বীর মতে— "শিব-শক্তি উপাসনা অথবা শক্তিপূজা ধনী জমিদারদের একচেটে ছিল। চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম সেই অচলায়তনে আঘাত করে গরীব চাষী মজুর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি সাধারণ লোকের মাঝে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে।"[৭৪] শ্রীচৈতন্যদেবের নেতৃত্বে নাম সঙ্কীর্তন ও ভক্তি আন্দোলন গোঁড়া ব্রাহ্মণ ও মুসলমানরা ভাল চোখে দেখেনি, তেমনি বৈষ্ণবরাও ব্রাহ্মণদের 'পাষণ্ডী' নামে চিহ্নিত করেছিল। শ্রীচৈতন্যদেব গণআন্দোলনের মধ্যে দিয়ে মুসলমান কাজীর নিপীড়নকে দমন করেন। তিনি এভাবে মধ্যযুগের ইতিহাসে প্রথম গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। বৈষ্ণবধর্মকে তিনি গণধর্মে পরিণত করেন।[৭৫] বর্ণাশ্রম কণ্টকিত হিন্দুসমাজকে তিনি প্রেমধর্মের ছত্রছায়ায় ঐক্যবদ্ধ করে শক্তিশালী করে তোলেন। বৈষ্ণবদের পবিত্র চরিত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, তস্কর, দস্যু এমন কি মুসলমানরাও বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দুর ধর্মীয় চেতনা নতুন ধারায় প্রবাহিত হয়ে শুধু সমাজের নিম্নকোটিতে অবস্থিত হিন্দুই নয় আদিবাসীদের মধ্যেও প্রসারিত হয়। ড: যদুনাথ সরকার 'হিসট্রি অব বেঙ্গল' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন- "চৈতন্যের প্রচারে বাংলার হিন্দুধর্মচেতনা নতুন ধারায় প্রবাহিত হয়; সেখানে বৈষ্ণব গোস্বামীরা শুধু সমাজের নিম্ন মধ্যবিত্ত দোকানদার ব্যবসাদারদের মধ্যে নয়, আদিবাসীদের মধ্যেও হিন্দুধর্ম ও সমাজচেতনা প্রসারিত করেন। বহুযুগ ধরে যারা অবহেলিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল তাদের মধ্যেও সভ্যতার আলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।'[৭৬] বস্তুত চৈতন্যদেবের পূর্বে কেউ-ই এমনভাবে রঘুনন্দন শাসিত বর্ণাশ্রম বিভক্ত সমাজে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য খর্ব করতে পারেননি। চৈতন্যদেবের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই বৈষ্ণব সমাজে ভেদাভেদ আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বৈষ্ণব সহজিয়াদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, সহজিয়ারা নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে বৈষ্ণবধর্মকে জরাজীর্ণ করে তোলে। বৈষ্ণব সমাজে ভিক্ষোপজীবী গুরুবাদী প্রথা জন্ম নিয়েছিল এবং তারা একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিগণিত হয়েছিল। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল কাব্যে এই শ্রেণীর কথা পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গলে ব্যাস চরিত্রটিও এজাতীয় চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে এসমস্ত তথ্যের সমর্থন রয়েছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত

মঙ্গলকাব্যগুলিতে অনেকটা জাতপাতহীন মুক্ত সমাজের চেহারা পাওয়া যায়, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে বৈষ্ণবধর্মের কথা থাকলেও জাতপাত, আচার-বিচারে জরাজীর্ণ সমাজের চেহারা দেখা যায়। মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ভণ্ডামী বৃদ্ধি পায়। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় সহনশীলতা একেবারে হ্রাস পায়। তাই পরিশীলিত বুদ্ধিমান মানুষের কাছে ধর্ম উপহাসের বিষয় হয়ে পড়ে। ভারতচন্দ্রের মত কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মধ্বজীদের ভণ্ডামীর মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছেন। দেবতাকে নিয়ে ভক্তির পরিবর্তে ঠাট্টা-তামাশা করেছেন। মানুষ দেবতাকে উপহাসস্পদ করে সামাজিক ব্যাভিচারের সহায়ক করে তুলেছিল, বিদ্যাসুন্দর কাব্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া ধর্মীয় তত্ত্ব-দর্শনের অপব্যাখ্যা সামাজিক ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের সৃষ্টি করেছিল। কবিগান, ঝুমুর গানে তৎকালীন সমাজের চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমগ্র মধ্যযুগে বাঙালী হিন্দুর জীবনে তন্ত্র-মন্ত্র, লৌকিক দেবদেবীর প্রভাব থাকলেও স্থির ধর্মবিশ্বাস ছিল না। পৌরাণিক দেবতা শিব, বিষ্ণু, শক্তি ও গণপতির উপাসক ছিল বেশীর ভাগ মানুষ, অর্থাৎ ব্যবহারিক ধর্মীয় জীবনে বাঙালী ছিল পঞ্চোপাসক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভক্তিবাদ প্রচার সম্ভব ছিল না বলে কোন দেবতার প্রতিই ভক্তি ছিল না। যুগ প্রতিনিধি হিসাবে ভারতচন্দ্র কোন ধর্মের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না, বরঞ্চ ধর্মীয় আচার-আচরণ বিলাস-ব্যসন ও ঐশ্বর্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র হয়ে উঠেছিল।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে মধ্যযুগীয় বাঙালী মুসলমানের ধর্মীয় জীবনের তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে এক শ্রেণীর নৈষ্ঠিক মুসলমানের পরিচয় পাওয়ায় যায়, যারা কঠোরভাবে ধর্মাচার পালন করত, আর তার সঙ্গে ছিল ধর্মান্তরিত দেশজ নব্য মুসলমানরা। তারা ধর্মীয় আচার খুব একটা জানত না। মধ্যযুগের প্রথম পর্বে ধর্মীয় কারণেই হিন্দু-মুসলমানের সহনশীলতা ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে পাশাপাশি বসবাসের ফলে সহনশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

হিন্দু-মুসলমানের দীর্ঘ দিনের সহাবস্থান বাহ্যিক জীবন অপেক্ষা ধর্মীয় জীবনে গভীরতর প্রভাব ফেলেছিল। তুর্কী মুসলমানগণ দীর্ঘ দিন এদেশে বসবাস করার ফলে নিজেদের সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে বহুদূরে চলে এসেছিল — ফলে তারা ধীরে ধীরে এদেশীয় ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। হুসেন শাহের রাজত্বকালে চট্টগ্রামের শাসক পরাগল খান ও তাঁর পুত্র ছুটি খান হিন্দুর পৌরাণিক কাহিনী রামায়ণ, মহাভারতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, এ কারণে তাঁরা কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে মহাভারতের অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই পরাগলী মহাভারতের জনপ্রিয়তার কথা জানা যায়। মধ্যযুগে কয়েকজন মুসলমান কবি বৈষ্ণবপদাবলী রচনা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, অভিজাত মুসলমান সমাজেও হিন্দু সমাজে পালিত পূজা-পার্বণ, জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু নিয়ে নানা সংস্কার পালিত হত। মনসামঙ্গলে হাসন-হোসেন ও কাজীর মনসাপূজা এবং ভারতচন্দ্রের কাব্যের মানসিংহ পালায় জাহাঙ্গীরের অন্নপূর্ণাপূজা একথা প্রমাণ করে। মধ্যযুগের মুসলমান কবিদের রচিত সাহিত্য থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তার বিবর্তন ঘটে গিয়েছিল বলেই কবিগণ অকপটে কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় হিসেবে সেগুলি গ্রহণ করেছিলেন, অবশ্য এ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে উভয় সমাজে নানা অসন্তোষ ধূমায়িত হয়েছে তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

নৃতাত্ত্বিক বিচারে অন্ত্যজ হিন্দু ও দেশজ ধর্মান্তরিত মুসলমানরা একই বংশোদ্ভূত। ধর্মান্তরিত দেশজ মুসলমানদের ধর্ম ছিল অপূর্ণ। কারণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও পুরুষানুক্রমে পালিত সংস্কারকে ত্যাগ করা সহজ ছিল না। সুতরাং হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের নানা সংস্কার-কুসংস্কার, আচার-বিচার, বিশ্বাস তারা প্রতিপালন করে এসেছিল — ফলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও তারা পরিপূর্ণ মুসলমান হয়ে ওঠেনি। মুসলমান সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের দ্বারা হিন্দু সমাজও কম প্রভাবিত হয়েছে তা নয়। অনেক হিন্দু মুসলমান পীর ও সূফিদের প্রতি এবং কোরানশরীফের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করত। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগর বাসরঘরে মনসার ক্রোধ থেকে

লখীন্দরকে রক্ষা করার জন্য হিন্দুস্থানী তাবিজ কবচের সঙ্গে কোরাণশরীফও রেখেছিল।[৭৭] লক্ষপতি সদাগরের পুত্র বাণিজ্যযাত্রাকালে হিন্দুর দেবদেবীর সঙ্গে আল্লাহ্‌কেও স্মরণ করেছিল।[৭৮] ধর্ম সম্পর্কিত চেতনার বিবর্তন ঘটেছিল বলেই কবিদের রচনায় এর বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। মানবতাবাদী কবিগণ ধর্মকেন্দ্রিক কৌম জীবনের সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে তাই ধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। এই সময়ে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলি ছাড়াও পূর্ববঙ্গগীতিকা, মৈমনসিংহগীতিকার বিভিন্ন পালায় হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বের কথা আছে।হিন্দুর উপর মুসলমান স্থানীয় শাসকের অত্যাচারের চিত্র আছে। বস্তুত রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার বিবর্তন ঘটে যেতে পারে। মুসলমান শাসনের শেষ প্রান্তে এবং ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভিক পর্বে মুর্শিদাবাদের নবাবদের শাসনকার্যে অবহেলা, বর্গীর হাঙ্গামা, পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণ, পরবর্তীকালে পলাশী যুদ্ধে সিরাজের শোচনীয় পরাজয় বাংলাদেশের বিশেষত নাগর সমাজের ভিত নষ্ট করে দিয়েছিল। ধনী, ছোট-বড় রাজা-জমিদার ও সামন্ত শাসকগণের স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ফলে হিন্দু সমাজের মত মুসলমানরাও অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়েছিল। হিন্দু কাব্যগুলিতে উল্লিখিত বীরের মত বীর কল্পনা করে মুসলমান সমাজেও কাব্য রচনা শুরু হয়েছিল। তাই সত্যপীর, বড় গাঁজী খাঁর মত দেবতা সৃষ্টি হয়। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি যেমন প্রবল হয়ে ওঠে তেমনি আচারে-বিচারে ধর্ম জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। আপন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে মানুষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত হয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যের মানসিংহ পালায় জাহাঙ্গীর ও ভবানন্দ মজুমদারের উক্তিতে তা ধরা পড়েছে। জাহাঙ্গীর হিন্দুর দেবদেবীকে ভূতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। হিন্দুর আচারের নিন্দা করেছেন। যেমন -

"আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম।
কহি যদি হিন্দু পতি পাইবে সরম॥
- - - - - - - - - - - - - - - -
এমন হিন্দুর ভূত দেখেছি বহুত।
মোরে কি ভুলাবে হিন্দু দেখাইয়া ভূত॥" (ঐ ৩০৫-৩০৬)

অপরদিকে মুসলমানের আচরণও হিন্দুর কাছে নিন্দনীয় ছিল। জাহাঙ্গীরের কথার উত্তরে ভবানন্দ বলেছেন –

"পুরাণের মত ছাড়া কোরাণে কি আছে।
ভাবি দেখ আগে হিন্দু মুসলমান পাছে॥
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
দেখিব হিন্দুর ভূত বাঁচায় কেমনে॥" (ঐ ৩০৭-৩০৮)

ষোড়শ শতাব্দী থেকে যে ধর্ম সহিষ্ণু সমাজ গড়ে উঠেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে তা ভেঙ্গে পড়েছিল।

মধ্যযুগে রাজনৈতিক ঘনঘটা জনমানসকে কতখানি পরিবর্তিত করেছিল তুর্কী আক্রমণ ও বর্গী আক্রমণের মত দু'টি ঘটনা থেকে বোঝা যেতে পারে। শূন্যপুরাণে উল্লিখিত নিরঞ্জনের রুষ্মা অনুযায়ী উচ্চবর্ণের হিন্দুর অত্যাচারে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধরা একদা তুর্কী যবনদের পরিত্রাতার ভূমিকায় দেখেছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে মুসলমান শাসকের অত্যাচারে জনসমাজ মারাঠা বর্গীদের পরিত্রাতা হিসাবে কামনা করেছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে জনমানসের এই আকুতি ধরা পরেছে। এই পর্বে সমাজ মানসের প্রতিনিধি হিসাবে কবিগণ শুধু হিন্দুর বিভিন্ন দেবদেবীর মধ্যে অভেদত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাই করেননি, হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণীর সাহিত্যে পীরকে কেন্দ্র করে এক জাতীয় সাহিত্য রচনা করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের আদর্শটি সমাজে তেমনভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলেও সমাজ মানসকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছিল। কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল কাব্যে, রামেশ্বর ভট্টাচার্যের সত্যপীরের কথায়, ভারতচন্দ্রের সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে তার প্রমাণ পাওয়ায় যায়। ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হলেও সকল ধর্মের

মূল বিষয় এক ও অভিন্ন বলে মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল, ফলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। সমাজ বিবর্তনের ফলেই জনগণের ধর্মীয় ভাবনা ও দেবভাবনাগত বিবর্তন মঙ্গলকাব্যগুলিতে ধরা পড়েছে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের ক্রম পরিণতিতে লক্ষ করা যায়— মানুষের ধর্ম বিশ্বাস ও ভক্তিভাবের ক্রম অবনতি দেখা দিয়েছে। মানুষের বিস্ময়বোধ ও দৈবনির্ভরতার অস্পষ্টতা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিবাদের বিকাশ ঘটতে থাকে। ভক্তি ক্রমশ রঙ্গব্যঙ্গের পর্যায়ে নেমে এসেছে, মুকুন্দের হরগৌরী ও ভারতচন্দ্রের হরগৌরীর পার্থক্যই সেকথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়। দৈববিশ্বাস ক্রমশ অবিশ্বাসে পরিণত হয়েছে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধেই এই অবিশ্বাস শুরু হয়েছিল। এই শতাব্দীর কবি জগজ্জীবনের কাব্যে মনসাপূজার সময় মনসার মাথার উপর চাঁদের নাম লেখা চাঁদোয়া টাঙ্গানো আসলে দেবতাকে পিছনে ফেলে মানুষের বিজয় সূচিত করেছে। সমাজজীবনের ক্রমপরিণতির ধারাতে এই ভাবটি সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। এখানেই আধুনিক যুগের ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তার প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে বিভিন্ন সময়ে রচিত মঙ্গলকাব্যে প্রাপ্ত যে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে তাতে একটা পরিবর্তনশীলতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুত মনসামঙ্গল - চণ্ডীমঙ্গল - ধর্মমঙ্গল - শিবায়ন ও অন্নদামঙ্গলের সংগৃহীত তথ্য সম্পূর্ণ একরূপ নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রেই সমাজবৃত্ত, অর্থনীতি, ধর্মবোধ ও মানুষের চেতনাগত গতিশীলতা লক্ষ করা গিয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলি অবলম্বন করে এই গতিশীল রূপকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। পরিশেষে কবিগুরুর শাশ্বত বাণী - "শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্ন শেষ পরে / ওরা কাজ করে।" এই সত্য উপলব্ধ হয়। বিবর্তনের ধারা বেয়ে 'ওরা' মধ্যযুগ বেয়ে আধুনিক যুগে উপনীত হয়েছে।

তথ্যপঞ্জী

১। বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, ডঃ অতুল সুর, পৃঃ ৫।

২। মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, অরবিন্দ পোদ্দার, পৃঃ ২৪৬-২৪৭।

৩। ঐ, পৃঃ ২৪১।

৪। জনৈক, প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃঃ ৬১।

৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রথম খণ্ড,পৃঃ ২৯০।

৬। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ৪৪।

৭। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, স্বামী বিবেকানন্দ, পৃঃ ৫১।

৮। বাঙালীর ইতিহাস, (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ২৭৯।

৯। বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, ডঃ অতুল সুর, পৃঃ ১৪২।

১০। বাঙালীর ইতিহাস, (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ২৭৮।

১১। বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৯৬।

১২। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা, সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৮৮।

১৩। ঐ, পৃঃ ১৯৩।

১৪। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ৪৮।

১৫। ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিধৃত সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, আহম্মদ শরীফ, পৃঃ ২১৭।

১৬। বাঙালীর ইতিহাস, (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ২৮৪।

১৭। রিয়াজ-উস-সালাতিন, গোলাম হুসায়ন সলীম, রামপ্রাণ গুপ্ত সম্পাদিত, পৃঃ ১৭।

১৮। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিলের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিটি গৃহীত, পৃঃ ৪৯।

১৯। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন, কঃ.বিঃ., ১৩৫৬, পৃঃ ১৫৬।

২০। ঐ।

২১। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিলের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিটি গৃহীত, পৃঃ ৫২।

২২। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ৫৪।

২৩। পূর্ববঙ্গগীতিকা (২য় খণ্ড), দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, পৃঃ ৫৫৪।

২৪। পদ্মাবতী, আলাওল, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৭১।

২৫। বাংলার সঙ্গীত (মধ্যযুগ), রাজ্যেশ্বর মিত্র, পৃঃ ৭৬।

২৬। মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ, গৌতম ভদ্র, পৃঃ ৪৬।

২৭। মৈমনসিংহগীতিকা, মলুয়া পালা, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, পৃঃ ৬৬।

২৮। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ৯৬।

২৯। ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, ভূমিকা অংশ (কবি-পরিচয়)।

৩০। মেয়েদের ব্রতকথা, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃঃ ৬৯।

৩১। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি, রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ৯৮।

৩২। পদ্মাবতী, আলাওল, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৬৭।

৩৩। বাংলার লোকসাহিত্য, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৬৯।

৩৪। ঐ, পৃঃ ৫৮২।

৩৫। ঐ।

৩৬। ঐ, পৃঃ ৫৮১।

৩৮। বাংলার লোকসাহিত্য, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৪৫।

৩৯। ছেলেভুলানো ছড়া, রবীন্দ্র রচনাবলী (দশম খণ্ড), পৃঃ ১৬৯।

৪০। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (২য় খণ্ড), ডঃ এম.এ. রহিম, পৃঃ ৩৫১।

৪১। মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের সন্ধানে, প্রভাত কুমার সাহা, পৃঃ ২৮।

৪২। ঐ, পৃঃ ৩০।

৪৩। ঐ, পৃঃ ৩১।

৪৪। ঐ।

৪৫। মুঘলযুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ, গৌতম ভদ্র, পৃঃ ১৩৬।

৪৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, সুকুমার সেন, পৃঃ ৩০৫।

৪৭। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৬৮।

৪৮। বাংলা মঙ্গলকব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, পৃঃ ৪২১।

৪৯। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ১২২।

৫০। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ২৯।

৫১। ঐ, পৃঃ ৩০।

৫২। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ১২৪।

৫৩। মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক-বিদ্রোহ, গৌতম ভদ্র, পৃঃ ১০৩।

৫৪। জাতিভেদ প্রথা ও ঊনিশ শতকের বাঙালী সমাজ, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৩।

৫৫। Social Mobility in Bengal, Hiteshranjan Sanyal, P 42.

৫৬। বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ), রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ২৮৩।

৫৭। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ৩১।

৫৮। ঐ, পৃঃ ৩৩।

৫৯। ঐ।

৬০। উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, সুশীলকুমার ভট্টাচার্য, পৃঃ ২২৫-২২৬।

৬১। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ৩৬।

৬২। ঐ।

৬৩। ঐ, পৃঃ ৩৯।

৬৪। মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক-বিদ্রোহ, গৌতম ভদ্র, পৃঃ ১।

৬৫। ঐ, পৃঃ ৩৮।

৬৬। ঐ, পৃঃ ৪৭।

৬৭। ঐ, পৃঃ ৫১।

৬৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড), ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১৬৬।

৬৯। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী, মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃঃ ১৩১।

৭০। বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ),রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ২৩০।

৭১। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা, সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২৪।

৭২। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৩৩৪।

৭৩। ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৮০।

৭৪। নীতি যুক্তি ও ধর্ম-কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ, বিমলকৃষ্ণ মতিলাল এর গ্রন্থ থেকে উক্তিটি সংকলিত, পৃঃ ১৪৫।

৭৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ২২৩।

৭৬। 'শ্রী চৈতন্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব' নীতি, যুক্তি ও ধর্ম — কাহিনী সাহিত্যে রাম ও কৃষ্ণ, বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, পৃঃ ১৪৬।

৭৭। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র ,সেন, কঃ. বিঃ.,১৩৫৬, পৃঃ৩১৯।

৭৮। ঐ।

ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত কবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল পুঁথির পাঠ ঃ-

১) "শুন ইন্দ্র তুমি ত্রিদেশের অধিকারী

- - - - - - - - - - - - -

কপট ভকতি মোরে কর বিড়ম্বনা।" (পৃঃ ৩৭)

২) "ইহা সুনি অগ্নিশর্মা বলে অভিরোষে

- - - - - - - - - - - -

ফিরাইল রাজপাত্র তার পাএ পড়ি।" (পৃঃ ২১০)

৩) "হইআ তুঞি রাজপুত বলাসি মৌলিক দত্ত

- - - - - - - - - - - -

কুলের মহিমা কৈলি নাশ।" (পৃঃ ১০৬)